আনন্দমেলা

আনন্দমেলা

ছড়া	পাহাররোলা। প্রেমেন্দ্র মিত্র ৬
গল্প	ভালুকের দোলনা। বলরাম বসাক ৭
	ভুতুড়ে ট্যাক্সি। সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩
উপন্যাস	সবুজ দ্বীপের রাজা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২০
	মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২৯
মহাভারতের গল্প	দ্রোণাচার্যের প্রতিজ্ঞাপূরণ। অমিতা চক্রবর্তী ১৬
বিশেষ রচনা	পুতুল, শুধু পুতুল। সন্দীপ সরকার ৫
	নীহার-মাসীর চিঠি ২৫
কমিক্স	ডাইনোসর-চুরি ১১, ১২
	টারজান ১৪, ১৫, ১৮, ১৯
	টিনটিন/কাঁকড়া-রহস্য ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৩
নতুন বিভাগ	বানাও। পূর্ণেন্দু পত্রী ১৩
	গাব্লু ২৭, ভাবতে পারো ৪১
আরও ছড়া	সর্ষে পড়া। সুনীল বসু ৫১
	ছড়াছড়ি। সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ৫১
প্রকৃতি-পরিচয়	ক্যাক্টাস্। মনোজ সান্যাল ৫২
	মাসটা আষাঢ়। দিদিমণি ৪৫
খেলাধুলো	ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানে এবারে জবর পাঞ্জা। স্ট্রাইকার ৪৫
	গ্যালারি থেকে ৫০
	বরফের উপরে দৌড়। কল্লোল মজুমদার ৫৪
নিয়মিত বিভাগ	বড়দের কথা। ইন্দ্রমিত্র ১০
	জানো নিশ্চয় ১৭
	ম্যাজিক। জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়ার ২৪
	আঁকো। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬
	মণিমেলার খবর ২৬
	ধাঁধা ২৮, আচ্ছা বলো তো ২৮
	আমাদের কলকাতা ৩৭
	শেখো ৪০
	বিজ্ঞান-বিচিত্রা। পার্থসারথি চক্রবর্তী ৪০
	মজার পড়া। কুম্ভক ৪৪
	ডোডো-তাতাই। তারাপদ রায় ৪৫
	তোমাদের পাতা ৫৫

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা
আষাঢ় ১৩৮৩ ॥ জুন ১৯৭৬
দেড় টাকা

প্রচ্ছদ-পরিচয়

সিল্‌কির শখ হয়েছিল, আরাম করে চেয়ারে বসে সেও তোমাদের মতো 'আনন্দমেলা' পড়বে। কিন্তু, ওরেব্বাবা, এ যে বাঘের ছবি! খৈরীর ছবির দিকে তাকিয়ে ছোট্ট সিল্‌কি তো হতভম্ব। বাস্, ফটোগ্রাফার অজিত সোম অমনি তার ছবি তুলে নিয়েছেন। শুনছি, সিল্‌কির ভয় ভাঙাবার জন্যে অজিতবাবু তাকে যশীপুরে নিয়ে খৈরীর সঙ্গে ভাব করিয়ে দেবেন।

অলংকরণ :

এই সংখ্যায় 'পাহাররোলা', 'সর্ষে পড়া' ও 'ছড়াছড়ি'র ছবি এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী, 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'র ছবি এঁকেছেন সুধীর মৈত্র; 'সবুজ দ্বীপের রাজা'র ছবি এঁকেছেন মদন সরকার; 'ভালুকের দোলনা' ও 'ভুতুড়ে ট্যাক্সি'র ছবি এঁকেছেন শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য।

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড এর পক্ষে অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি. আই. টি. রোড, কলিকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

মাইসোর স্যাণ্ডাল সোপ
গৌরবময় ভারতীয় ঐতিহ্য প্রতিযোগিতা
রঙীন করার প্রতিযোগিতা
১৬ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য
(১৯৬০ সালের ৩১শে মের পর যাদের জন্ম)
সম্পূর্ণ খবরের জন্য যে-কোন বড় দোকান থেকে প্রবেশপত্র নিয়ে এসো। কিম্বা এখানে লেখো:
এম এস আই এল (সোপ ডিভিসন)
৩৬, ক্যানিংহাম রোড,
বাঙ্গালোর ৫৬০ ০৫২
২৫০০০ টাকারও বেশী মূল্যের ভাল ভাল পুরস্কার জিতে নাও
পুরস্কার বিজয়ীদের পরিবারের লোকেদের জন্য ৩০টি অতিরিক্ত পুরস্কার
MCA/MSIL/SS/54 ben
BANGALORE
শিগ্‌গীর!
শেষ তারিখ এখন বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৫ই জুন, ১৯৭৬
মাইসোর স্যাণ্ডাল
স্নানের বিলাসিতায় গৌরবময় ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক
বাঙ্গালোরের গভর্নমেণ্ট সোপ ফ্যাক্টরীর উৎকৃষ্ট উৎপাদন
বিক্রেতা মাইসোর সেলস ইণ্টারন্যাশনাল লিঃ, বাঙ্গালোর

আলোকচিত্র
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুতুল শুধু পুতুল

সন্দীপ সরকার

কোনো দিন বিকেলবেলায় হয়তো তোমার ইচ্ছে হবে। ইতস্তত না ক'রে সোজা চলে এসো গোলপার্কে। সিটি কলেজের পাশের বাড়িতে (২৩।৪৮ গড়িয়াহাট রোড) থাকেন ইলা রাউতের দিদি। সারাদিন কাজের পর দিদির বাড়ির বাইরের ঘরে বসে ইলা তৈরী করেন পুতুল। এই ঘরটা তাঁর কাজের ঘর বা স্টুডিও।

মনে হবে বুঝিবা অন্য রাজ্য। কল্পনা দিয়ে তৈরী আলো-ছায়ার স্বপ্ন-মাখা জগৎ। না, তিনি কিন্তু রাজা রানী-পুতুল করেন না। সওদাগর-পুত্র বা কোটালপুত্র নেই। এই যে আমাদের ধুলো-মাটির জগৎ, যেখানে আমার মতো আটপৌরে মানুষ আর তোমাদের মতো সাদাসিধে ছেলেমেয়েরা থাকে তারই কাহিনী বলেন। অথচ লক্ষ করে দেখো, এই পুতুল-গুলো আমাদের মতো নয়। পুতুল তা হয়ও না। ওরা যেন অন্য গ্রহের মানুষ।

ইলা রাউতের জন্ম ময়মনসিং-এ। ছেলেবেলায় ছবি আঁকতেন, দেশলাইয়ের বাক্স, পিচবোর্ড এইসব দিয়ে বাড়ি-ঘর বানাতেন, তৈরী করতেন পুতুল। বাড়ি থেকে প্রচুর উৎসাহ পেতেন। কিন্তু দেশভাগের পর ভাগ্যের ফেরে আসতে হল কলকাতায়। শুরু হল দুঃখ-কষ্টের জীবন। একদিকে চলে পড়াশুনো। ফাঁকে ফাঁকে পুতুল তৈরী করা। ছবি আঁকা।

১৯৬৩ সালে 'কর্মকুটীরে' ভর্তি হলেন তিনি। দশ মাস ধরে পুতুল তৈরী শিখলেন। তারপর বম্বে গিয়ে পুতুল তৈরীর আধুনিক সব কায়দা-কানুন শিখলেন হাতে কলমে। পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। কলকাতায় ফিরে চার বন্ধুতে মিলে 'ইউাঁস-বিলা' নাম দিয়ে পুতুল তৈরির একটা স্টুডিও খুলে ফেললেন।

শিশুদের ভালবাসেন ইলা রাউত। দেশ-বিদেশের ছেলে-মেয়েদের খেলাঘরে কতরকম পুতুল থাকে, নানারকম খেলনা। ছেলেবেলায় নিজের পুতুল নিজেই তৈরী করতেন। কিন্তু সব শিশু তো তাঁর মতো নয়। তারা আবার কিন্তু অনেক-কিছু পারে, যা তিনি পারেন না। আচ্ছা তাদের জন্যে যদি খেলার পুতুল তৈরী করা যায়? পুতুলগুলো সুন্দর হবে, আবার সস্তাও হবে। কয়েকদিন থেকে এই এক চিন্তা মাথায় ঘোরে। খেতে মন লাগে না। শুতে ইচ্ছে করে না। খাতা কলম নিয়ে ছবি আঁকেন। ঠিক মন ওঠে না।

একদিন রাত্রে হঠাৎ মনে হল জন্তু-জানোয়ার কে না ভাল-বাসে? চিড়িয়াখানায় গেলে কে না খুশী হয়? সুতরাং কিছু জন্তু-জানোয়ার করলে কেমন হয়? এই ধরো হাতি-ঘোড়া, ভালুক, কুকুর, ব্যাঙ। সাধারণভাবে এইসব পশুদের যেমন দেখি তার থেকে একটু অন্যরকম হবে। মজার রকম। কুকুরকে কুকুর বলে চেনা যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু এই কুকুরের জুড়ি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ যে খেলাঘরের কুকুর।

একসময় 'ধুত্তোর' বলে কাগজ পেন্সিল ফেলে কাপড়, তুলো, ছুঁচ সুতো নিয়ে বসে গেলেন তিনি। মনের মধ্যে ডুব দিলেন। চোখের সামনে ভেসে উঠল নানা রূপ আর আকার। একমনে কাজ করে চলেন। ভুলে যান নাওয়া খাওয়া। শেষ পর্যন্ত হাত থেকে বেরিয়ে এল, যা যা তিনি চাইছিলেন। মনে প্রশ্ন, অন্যদের ভাল লাগবে তো? পাশের বাড়ি থেকে ধরে আনলেন দুটি ছেলেমেয়েকে। তারা দেখে হাততালি দিয়ে উঠল। বুঝলেন, তাঁর কাজ সার্থক।

অনেকের গাড়ির উইণ্ডস্ক্রীনে পুতুল দেখেন ইলা রাউত। বিদেশী পুতুল। মাথায় আগুন ধরে যায়। আবার তিনি কাজে নামেন। কয়েকদিনের মধ্যে নকশা থেকে ছোট ও সুন্দর সব পুতুল তৈরী করে ফেলেন। এইসব পুতুল সকলের খুব পছন্দ।

কাজ করে চলেন। খেলার পুতুল বা মোটরগাড়ির উইণ্ড-স্ক্রীনের পুতুল শুধু সময় কাটাবার জন্যে করা। এমন পুতুল তৈরী করতে হবে, যা কিনে মানুষ ঘর সাজাবে। নিছক শৌখিন পুতুল নয়, তার চেয়েও কিছু বেশী। এত সুন্দর হবে যে, দেখামাত্র লোকে সংগ্রহ করতে চাইবে।

এসব ভাবতে ভাবতে মনে হয়, ভারতবর্ষের মানুষ তিনি। কত বৈচিত্র্য এদেশের মানুষের কেশ, বেশ, চলায় বলায়। কাপড় পরার ধরন কত অসংখ্য রকম। গয়নার ডিজাইন। এইসব বৈশিষ্ট্য পুতুলের মধ্যে আনতে হবে। ভাষায়, পোশাকে পরস্পর থেকে কত আলাদা আমরা, তবু এক দেশের অধিবাসী। অমিলের চেয়ে মিলই বেশী।

এই ভাবটা পুতুলে আনতে হবে। ধরতে হবে। বিভিন্ন প্রদেশের আচার-আচরণ সম্বন্ধে কিছু পড়লেন। কলকাতায় ভিন-প্রদেশী মানুষদের সঙ্গে মেশার সময় চোখ-কান খোলা রাখেন। কলকাতার বাইরে বেড়াতে গেলে ভাল করে লক্ষ করেন তাদের হাবভাব, ভঙ্গী।

শেষে অনেক প্রস্তুতির পর শুরু করেন কাজ। কাগজের মণ্ড দিয়ে পুতুলের শরীর তৈরী হয়। কখনো এর জন্যে ছাঁচ বানান, কখনো সরাসরি মণ্ড জমিয়ে কাজ করেন। পুতুলের শরীর এবার শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে মেজে নিয়ে মোটরগাড়ির ডুকো রঙ লাগাতে হয়। এতে একটা ঝকঝকে ভাব আসে, তবে সেটা চীনামাটির মতো চকচকে নয়। বরং কিছুটা ম্যাটম্যাটে। তারপর চোখ নাক ভুরু আঁকাজোকা চলে। তুলি দিয়ে একটু কারিকুরি আর কী! এবার জামা কাপড় কেটে সেলাই করতে হয়। ধরো উটওয়ালী রাজস্থানী মেয়ের ঘাঘরা কামিজ আর পাঞ্জাবী মেয়ের সালওয়ার আর ওড়নার মধ্যে ছাঁটকাটের পার্থক্য অনেক। মহারাষ্ট্রী বৃদ্ধের সৌম্যভাবের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের ভদ্রলোকের অমিল তো শুধু ব্যক্তিত্বের নয়, কাপড় পরবার পার্থক্যও অনেকখানি। পাগড়িরও তফাত থাকে। মহারাষ্ট্রী ভদ্রলোকের সাদা পাগড়ি আর শিখেদের রঙিন পাগড়ি বাঁধার কতো প্রভেদ। তারপর আছে মেয়েদের গয়নার নানা ডিজাইন। রাজস্থানী মহিলার ভারী রুপোর গয়না আর দক্ষিণী ভদ্রমহিলার নাকে হীরের ফুল, গলার মঙ্গলসূত্রম—অমিল কি কম। এইসব খুঁটিনাটি বিষয়ে এক অঞ্চলের লোকের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের লোকের পার্থক্য।

তাছাড়া আর একটা বড় অমিল আছে। সেটাকে বলে নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য। 'নৃ' মানে নর বা মানুষ। নৃতত্ত্বের একটা দিক মানুষের শরীরের বিশেষত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করে। ইলা রাউত ভাল করেই জানেন, পুতুল করতে গেলে কিছুটা নৃতাত্ত্বিক জ্ঞান থাকা দরকার। ভারতবর্ষে নানা জাতি এসে মিশেছে। পাশাপাশি বাস করতে করতে তারা এক হয়েছে। দ্রাবিড়, আর্য, শক, পাঠান, মুঘল ও আদিম উপজাতি মিলে-মিশে আমরা হয়েছি। কিন্তু এইসব জাতির চেহারা আলাদা ছিল বলেই প্রদেশে-প্রদেশে মানুষের চেহারার অমিল। অসমীয়া আর পাঞ্জাবী, দক্ষিণী আর জাঠ, এদের সকলের চেহারাই সুন্দর কিন্তু আলাদা। পুতুল বানাবার সময় ইলা রাউত এইসব বিষয় ভাবেন। বিচিত্র মানুষ আর তার বিচিত্র ধরন-ধারণ। এসব ঘর সাজাবার পুতুল, তাই কাঠের ওপর দাঁড় করিয়ে দেন। কাচের আলমারিতে রাখার পক্ষে ভাল।

তাই বলছি কোনো দিন বিকেলে বা ছুটির দিন সুযোগ পেলে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসো না ইলা রাউতের কাছে। ভাব করো না এসে এইসব পুতুলের সঙ্গে।

পাহাররোলা

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছড়া

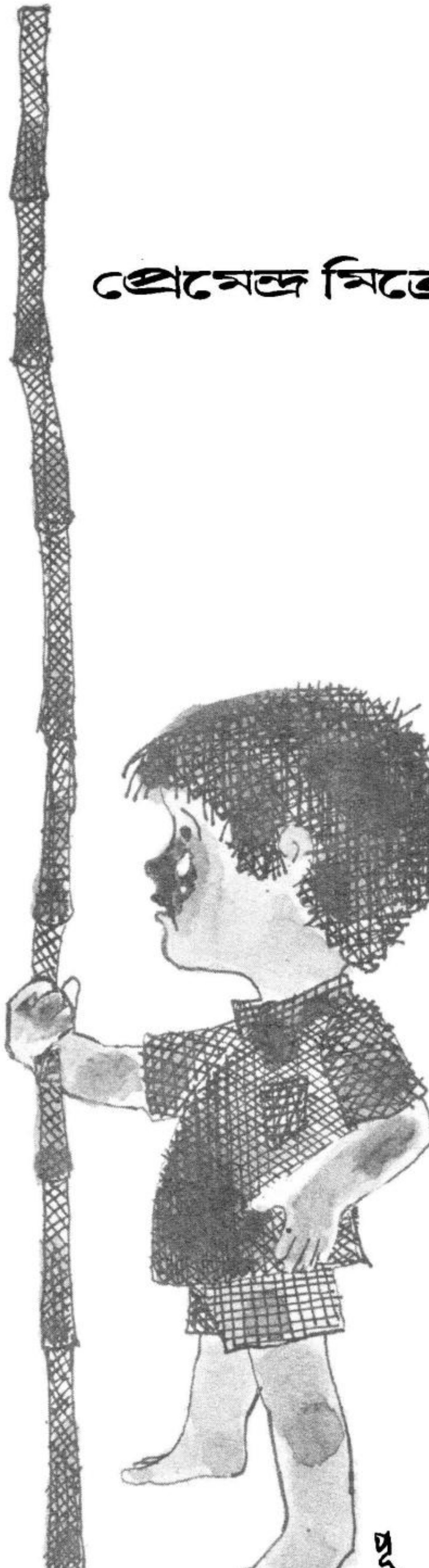

হাতে নেই কো ঝুমঝুমি,
ওরে বাব্বা! কে গো তুমি?
কী বলছ? পাহাররোলা!
তা, মুখখানি তো ভোলা-ভোলা,
জামা পেন্টু ঢোলা-ঢোলা,
চোখ দুটি কি একটু ফোলা?
হয়েছে কী?

হবে আবার কী? কেঁদেছি!
পাহাররোলার কাঁদতে নেই?
ডাকাত ধরি শুধু হাতে-ই,
মোড়ে দাঁড়াই, গাড়ি থামাই,
ধমক দিয়ে চোরকে ঘামাই,
তবু কেন বলবে দাদা,
'ও জাঁদরেল পাহাররোলা
পেন্টুতে যে বোতাম-ই নেই।'

বলরাম বসাক

ভালুকের দোলনা

এক ছিল ছোট্টখাট্টো ভালুক। তার ছিল এইটুকুনি ছানা। নাম টিউ। খুদে খুদে হাত-পা—ছোট্ট ছোট্ট চোখ। পিট্ পিট্ করে তাকায়। এত ছোট্ট যে হাঁটতেই শেখেনি। ছোট্টখাট্টো ভালুক 'টিউ'র একটু-একটু হাত ধরে হাঁটি-হাঁটি পা-পা হাঁটতে শেখায়।

একদিন ঠিক ওমনি করে হাঁটি-হাঁটি শেখাচ্ছিল। এমন সময়. এত্তো বড় একটা হাতি এল হেলতে দুলতে। তার থামের মত ইয়া ইয়া পা। কুলোর মত কান। মুলোর মত দাঁত।

"কী গো ছোট্টখাট্টো ভালুক," হাতিদাদা বলল, "ছেলে কতটা হাঁটতে শিখল?"

"এই তো, এক্কেপেয়ে তালগাছটা থেকে ঐ মুখ-বোজা পাতকুয়োটা পর্যন্ত," তারপর ভালুক বলল, "তোমার ছেলে কতটা হাঁটতে শিখল?"

"আমার ছেলে?" হাতিদাদা শুঁড়টা এদিক-ওদিক দুলিয়ে হেঃ হেঃ করে হাসল, "আমার ছেলে? বনের ভেতর ঘুর ঘুর করে। কলা খায়। আখ খায়। হাওয়া খায়। দোলনায় চড়ে দোল খায়, ইস্কুলে মাস্টারবাবুর কানমলা খায়। হিঃ হিঃ!" বলতে বলতে হাতিদাদা চলে গেল।

শুনে ছোট্টখাট্টো ভালুকের মন খারাপ হয়ে গেল। তার ছোট্ট ছানা 'টিউ' এক্কেবারে এইটুকুনি। কতদিন হয়ে গেল, এখনো হাঁটতে শেখেনি। কী করে হাতি-দাদার ছেলের মত বনে ঘুরঘুর করে বেড়াবে। অবিশ্যি দোলনায় বসে দোল খেতে পারে। হাতিদাদার অত বড় ছেলে যদি দোলনায় দোল খায়, তা হলে অত ছোট্ট ভালুকের এইটুকুনি ছেলে, টিউ দোলনায় চড়ে দোল খেতে কেন পারে না?

তখন ছোট্টখাট্টো ভালুক করল কী, এইটুকুনি ছানা টিউকে লম্বা-কান খরগোশদিদির কোলে রেখে কলা-বনে গেল।

কলাবনে গিয়ে, কলাগাছের খোল কাটল। তারপরে কুল-বনে গেল। কুল-বনে কুলগাছের ডালে ডালে ছোট্ট ছোট্ট রুপোলী রেশম-গুটি ঝুলছিল। ভালুক রেশমগুটিগুলি পেড়ে নিল। তারপর ফুল-বনে গেল। ফুল-বনে কত রকমের ফুল। ছোট্ট-খাট্টো ভালুক শুধু লাল-টুকটুকে মাদার ফুল, সোনালী-হলদে সোঁদাল ফুল, গাঢ় নীল সানাই ফুল আর ডালসুদ্ধু কাঠচাঁপা—সব পেড়ে, ছোট্ট চাকা-কাঠের গাড়ি বোঝাই করে বাড়ি এল। বাড়ি এসে একটা আইস্ক্রিম খেয়ে রেশমগুটি থেকে সুতো

বানাতে বসল।

দুষ্টু শালিক কেঁচো খুঁজছিল। বলল, "কিচো কিচো, কী করচো?"

"ছোট্ট সোনা ভালুকমণি টিউর জন্যে দোলনা বানাচ্ছি," ভালুক বলল। অনেক অনেক রেশমী সুতো তৈরি করে, তারপর খানিকটা মাদার ফুল পিষে তৈরি করল লাল টুকটুকে রঙ। খানিকটা সোঁদাল ফুল পিষে হলদে রঙ। তারপর খানিকটা নীল সানাই ফুল পিষে নীল রঙ। কাঠচাঁপার ডাল ভেঙে-ভেঙে সাদা রঙ বার করল। এখন ছোট্টখাট্টো ভালুকের কাছে কী কী রঙ?

লাল, নীল, হলদে আর সাদা।

নাহ্। এতে হবে না তো, আরো অনেকরকম রঙ চাই।

তখন ভালুক একটুখানি নীল রঙের সঙ্গে একটু-খানি হলদে রঙ মিশিয়ে সবুজ রঙ তৈরি করল। একটুখানি লাল রঙের সঙ্গে একটুখানি সাদা রঙ মিশিয়ে গোলাপী রঙ তৈরি করল। তারপর একটুখানি হলদে রঙের সঙ্গে লাল রঙ মিশিয়ে কমলা রঙ তৈরি করল। তারপর একটুখানি লাল রঙের সঙ্গে নীল রঙ মিশিয়ে বেগুনী রঙ তৈরি করল। এখন ছোট্টখাট্টো ভালুকের কাছে কী কী রঙ?

লাল, নীল, হলদে, সাদা, সবুজ, গোলাপী, কমলা, আর বেগুনী।

চারদিকে তখন কী ভিড় কী ভিড়! হলদে-ঠোঁট হাঁস, লাল-ঝুঁটি মোরগ, কান-খাড়া খরগোশ, লেজে-লাল-ছোপ বুলবুল, সাদা-কালো খঞ্জনা, সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে, বলছে, প্যাক্ প্যাক্, টুই টুই, চাক্ চাক, কোকর কো!

"ছোট্টখাট্টো ভালুকদাদা, কী করছো, কী করছো?"

"দোলনা বানাচ্ছি।" তারপর ভালুক রেশমী সুতো-গুলো লাল, হলদে, নীল, সবুজ সবরকম রঙে রাঙিয়ে তা দিয়ে তৈরি করল মস্তো—মস্তো বড় একটা রঙিন জাল। জালের দুটো পাশ আমলকি গাছের লম্বা ডালে ফাঁক করে বেঁধে দিল আর জালটাকে ঠিক দোলনার মত ঝুলিয়ে দিল। কলাগাছের খোলটাকে নৌকোর মতন সুন্দর করে কেটে, জালের মাঝখানে বসিয়ে দিল। দিয়ে, সেটাকে জালের সঙ্গে ভালো করে বেঁধে দিল। বাস্, দোলনা হয়ে গেল।

তখন চারদিকে কী হৈচৈ। কী ভিড়, কী ভিড়! সবাই দোলনা-বানানো দেখতে এসেছে। লম্বা-গলা জিরাফ, দাড়িওয়ালা রামছাগল, কাছিম খুড়ো, শজারু কাকা, হুলোমাসী, লেজটি তুলে কাঠবেড়ালী, হেলতে দুলতে হাতিদাদা, সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে বলছে, "বাহ্, ছোট্টখাট্টো ভালুকের কী বুদ্ধি!"

তখন পাশ দিয়ে ডোরাকাটা বাঘমশাই কালো কোট প্যান্ট পরে, আর মোষমশাই সাদা ধুতি-চাদর পরে, 'পোষের শীত মোষের গায়, মাঘের শীত বাঘের গায়' এই সব বলতে বলতে আপিস থেকে ফিরছিল। ভিড় দেখে তারাও দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঘেউ আর ঘেউ-এর বৌ কেউ যাচ্ছিল সিনেমা দেখতে। এত ভিড় দেখে ঘেউ তার বৌকে ডাকল, "বৌ-বৌ-বৌ-বৌ-বৌ—"

ঘেউ-এর বৌ কেউ, একটু পিছিয়ে পড়েছিল, ছুটে এসে বলল, "কেউ।"

"ওখানে কী হচ্ছে রে?"

কেউ দূর থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে বলল, "ছোট্ট-খাট্টো ভালুক তার ছানা টিউর জন্যে দোলনা বানাচ্ছে। ওর ছানাকে ও কত ভালবাসে..."

ঘেউ সব দেখেশুনে বলল, "তোর ছানা 'কুই-কুই'দের জন্যে দোলনা বানাসনি কেন রে?'

"সে তো তুই বানাবি?"

"আমি কেন, তুই তো—"

"না, তুই!"

বাস, ঘেউ-এ কেউ-এ কী ঝগড়া। অনেকক্ষণ ঝগড়াটা চলত, যদি হাতিদাদা ওদের খুব করে ধমকে না দিত।

তারপর?

তারপর, যা ফুল বেঁচে ছিল, লাল, নীল, হলদে আর কাঠচাঁপা, সব—সব দিয়ে ছোট্টখাট্টো ভালুক দোলনাটাকে কী সুন্দর করে সাজালো। টিউকে লাল মোজা-জুতো আর লাল টুপি পরিয়ে তার ওপর বসিয়ে দিল। বসিয়ে দিয়েই দোলনাটাকে দিল দুলিয়ে। কী হাসি, কী খুশি!

তখন হাঁস মুরগি ওরাংওটাং চিতাবাঘ সব্বাই পালা করে দোলনায় দোল দিতে দিতে বলল:

দোলে দোলে কে দোলে

ভালুকছানা টিউ দোলে

বনের সব্বাই এসেছে। উদ্‌বেড়ালে খুদ্ খাচ্ছিল, সেও এসেছে। আসেনি শুধু রাক্ষুসে নেকড়েটা।

ওমা, কেন? নেকড়ে আসেনি কেন? ও কি খবর পায়নি?

"কী জানি! না এসেছে ভালই হয়েছে। ও যা হিংসুটে। ভীষণ হিংসুটে। কারুর সঙ্গে মেশে না। খালি দোষ খুঁজে বেড়ায়। আর একবার দোষ খুঁজে পেলে কারুর রক্ষে আছে, গ্যাঁক করে কামড়ে ধরে কুড়মুড় করে হাড় চিবোয়। অবিশ্যি দোষ না পেলে কিছু বলে না।

নেকড়ে বাঘ এখন কী করছে, বলো তো?

নেকড়ে বাঘ এখন একা একা বনের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাবার খুঁজছে। ভীষণ খিদে পেয়েছে কিনা। বলে কি, "ওহ্, বড্ড খিদে পেয়েছে। আজকাল আর হাঁস-ফাঁস, মুরগি-টুরগি, বাঘ ভালুকের ছানাপোনা, কারুর কোন দোষ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই তো, কী যে করি। যাক্ গে, কলা-বনেই যাই। বসে বসে কলা খাই।" বলেই দুম করে ঢুকে পড়ল কলা-বনে। ঢুকেই দেখে একটা কলাগাছ কাটা!

"কে কেটেছে এই কলাগাছ?"

কলাগাছগুলো পাতা নেড়ে ফিসফিস করে বলল, "ছোট্টখাট্টো ভালুক।"

"হুম্, ছোট্টখাট্টো ভালুকের একটা দোষ পাওয়া গেল।"

তারপর কলা-টলা খেয়ে কয়েকটা কলা ঝুলিতে বেঁধে রাক্ষুসে নেকড়ে বলল, "এবার আমি কুল পাড়তে যাব।"

কুল-বনে গিয়ে দেখে কী, কুলগাছে রেশমগুটিগুলি নেই। সোনালী মথেরা কাঁদছে। ওদের কাঁদতে দেখে রাক্ষুসে নেকড়ে বলল, "সোনামথ, সোনামথ, কে পেড়েছে রেশমগুটি?"

সোনালী মথেরা ফুরফুর করে ডানা নেড়ে বলল,

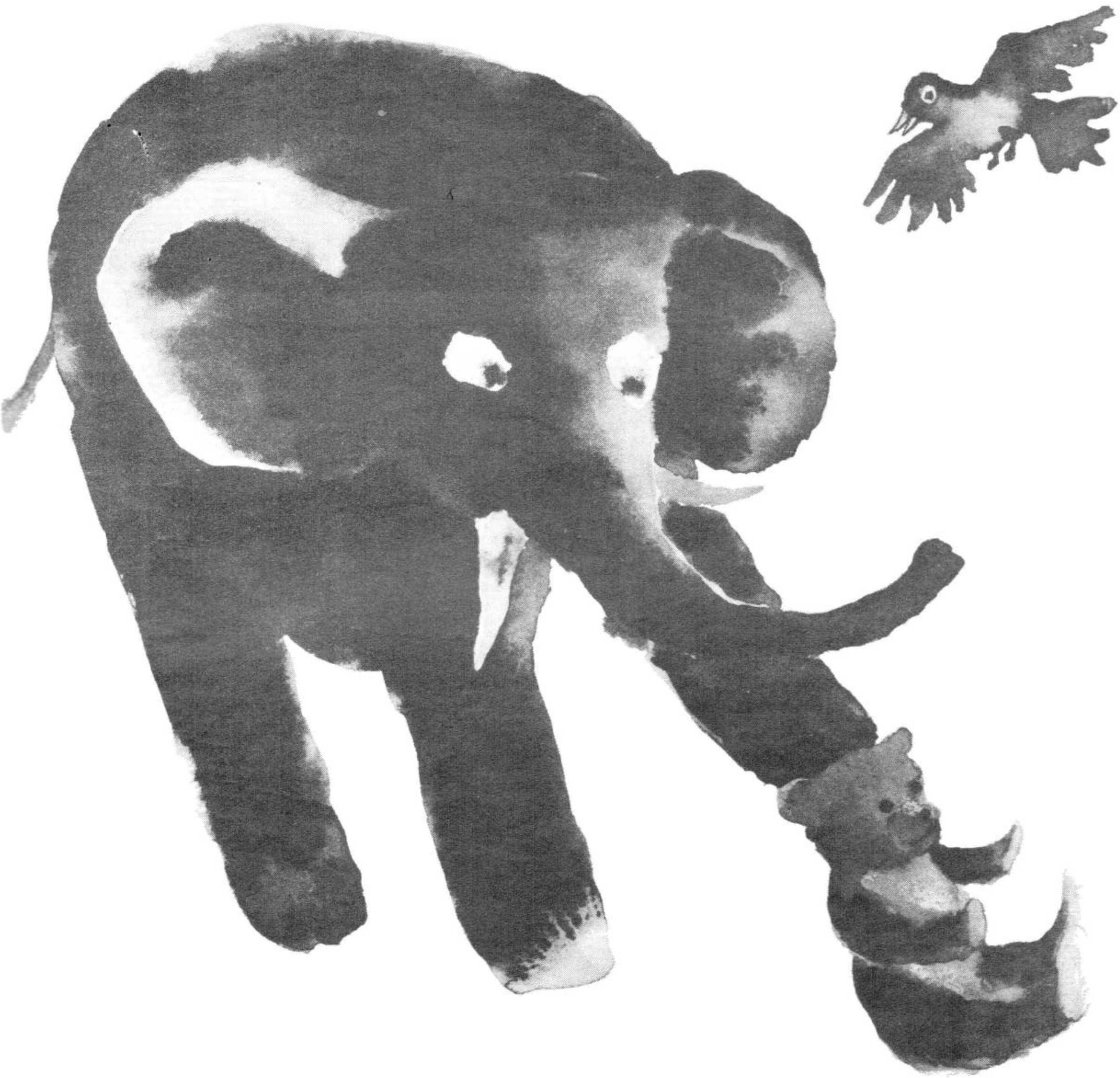

"ছোট্টখাট্টো ভালুক।"

"হুম্, ছোট্টখাট্টো ভালুকের দুটো দোষ পাওয়া গেল।"

কুল পাড়া হয়ে গেলে নেকড়ে বাঘ বলল, "আমি তো বনের রাজা। তাই গলায় ফুলের মালা পরব।" তাই সে ফুল পাড়তে ফুল-বনে গেল। ফুলবনে গিয়ে দেখে কী, লাল মাদার ফুল, হলদে সোঁদাল ফুল, নীল সানাই ফুল আর কী ফুল যেন,—সব কে পেড়ে নিয়ে গেছে!

"এসব ফুল কে পেড়েছে?"

গাছগুলোর পাতা ফিসফিস করে বলল, "ছোট্টখাট্টো ভালুক।"

"আর রক্ষে নেই, ছোট্টখাট্টো ভালুকের তিন তিনটে দোষ।" বলতে-বলতে নেকড়ে বাঘ হালুম করে ছুটে গেল আমলকি-তলা।

এদিকে হয়েছে কী, অনেক রাত হয়ে গেছিল তো, তাই হাঁস মুরগি উদ্‌বেড়াল সব্বাই বাড়ি চলে গিয়েছিল। ছোট্টখাট্টো ভালুক তার ছানা টিউকে দুধ খাইয়ে, দোলনায় শুইয়ে দিয়েছে। আকাশে গোল চাঁদ। আমলকি গাছের আমলকিগুলো চাঁদের আলোতে রুপোলী বলের মত দুলছিল। গাছের তলায় ঝিলমিলি আলোয় দোলনাটাকে দোলাচ্ছিল ভালুক আর বলছিলঃ

"আয় আয় চাঁদমামা টি দিয়ে যা, টিউর কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা।"

বলতে বলতে ছোট্টখাট্টো ভালুক একদিকে ঘুমে ঢলে পড়েছিল। ঠিক সে-সময় নেকড়ে বাঘ এসে বলল, "হালুম। আমি দোলনার ফুল ছিঁড়ব।"

রাক্ষুসে নেকড়েটা কিন্তু সত্যি সত্যি ছিঁড়ে ফেলত যদি হাতিদাদা কাছে-পিঠে না থাকত।· ভাগ্যিস্ হাতিদাদা কুলোর মত কান নাড়তে নাড়তে এসে পড়েছিল। "কেন, কেন, ফুল ছিঁড়বে কেন?"

"ছোট্টখাট্টো ভালুকের এক নম্বর দোষ ও ফুল-বনের ফুল ছিঁড়েছে।"

"ফুল-বনে তো আবার ফুল ফুটবে।" হাতিদাদা বলল।

"তা বটে," নেকড়ে বলল, "ছোট্টখাট্টো ভালুকের দুই নম্বর দোষ, সে কুল-বনে রেশমগুটি পেড়েছে। আমিও ওর দোলনার রেশমী জাল ছিঁড়ব।"

"কুল-বনে তো রেশমগুটি আবার হবে।"

"তা বটে," নেকড়ে বলল, "ছোট্টখাট্টো ভালুকের তিন নম্বর দোষ, কলা-বনে কলাগাছ কেটেছে। আমিও ওর দোলনা ভেঙে ফেলব।"

"কলা-বনে কলাগাছ তো আবার হবে।"

"তা বটে, তা হলে আমি ওর টিউকে নিয়ে যাব।" বলেই নেকড়েটা গ্যাঁক করে দাঁতে কামড়ে টিউকে প্রায় তুলতে যাচ্ছিল, ঠিক তক্ষুনি হাতিদাদা শুঁড় দিয়ে নেকড়ে বাঘকে ঠেলে দিলে, বললে, "আরে শোন শোন, টিউকে নিয়ে যেও না। টিউকে নিয়ে গেলে ছোট্টখাট্টো ভালুক খুব কাঁদবে। এমনিতেই টিউয়ের জন্যে ছোট্টখাট্টো ভালুকের কত দুঃখ।"

"কেন দুঃখ কেন?" নেকড়ে বলল।

"টিউ আর আমার ছেলে একই দিনে হয়েছিল," হাতিদাদা বলল, "আমার ছেলে বনের মধ্যে দিব্যি ঘুরছে ফিরছে, অথচ ছোট্টখাট্টো ভালুকের ছেলে এখনো হাঁটতেই শেখেনি।"

"কেন, এখনো হাঁটতে শেখেনি?"

"ওর যে এইটুকু এইটুকু পা, এইটুকু এইটুকু চোখ; পুঁতি বসানো।"

"কেন এইটুকু এইটুকু?" নেকড়ে বলল।

"টিউ যে কোন দিন বড় হবে না।"

"কেন কোন দিন বড় হবে না?"

"ওর যে বুকের মধ্যে নরম তুলো আর—"

"আর?"

"আর পেট টিপলে মুখ দিয়ে শব্দ করে টিউ-টিউ-টিউ।"

"কেন টিউ-টিউ শব্দ করে?"

"ওর যে গলার মধ্যে বাঁশি রয়েছে, আর—"

"আর?"

"ওর ভেতরটা ফাঁপা, পেটটা রবারের তৈরি।"

"ও!" রাক্ষুসে নেকড়েটা গালে হাত রেখে অবাক। টিউ কি তাহলে একটা পুতুল-ভালুক? আর এই পুতুলটাকেই ছোট্টখাট্টো ভালুক হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে হাটতে শেখায়। দুধ খাওয়ায়। 'চাঁদের কপালে টি দিয়ে যা' বলে ঘুম পাড়ায়। আর ওর জন্যেই এই সুন্দর দোলনাটা বানিয়েছে? সত্যি ছোট্টখাট্টো ভালুকের অনেক দুঃখ।

"নাহ্, ছোট্টখাট্টো ভালুকের কোন দোষ নেই।" বলেই নেকড়ে বাঘ চলে গেল।

বড়দের কথা / ইন্দ্রমিত্র

সম্পর্কে স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মামা। নাম ছিরু। একই ইশকুলে একই ক্লাসের ছাত্র দুজনে। ছিরু সে-সময়ে ভূদেবদের বাড়িতেই থাকে। অতি বাজেমার্কা ছেলে ছিরু।

কিন্তু ইশকুলে ছিরুই ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে।

প্রাইজে বই দিয়েছে কয়েকখানা। প্রত্যেকটি বইয়ে ছিরুর নামে লেবেল লাগানো। ভূদেবের নামে কোনও প্রাইজ নেই। ছিরুর মতো ছেলে প্রাইজ পেল, অথচ ভূদেব কিছুই পেল না? ভূদেবের মা-বাবা খুব দুঃখ পেলেন। কিন্তু কী আর করা যায়।

মাসকয়েক পর ভূদেবের সেজোকাকার সঙ্গে ইশকুলের একজন মাস্টারমশায়ের দেখা। কথায় কথায় ইশকুলের কথা উঠল। মাস্টারমশাই বললেন, "আপনার ভাইপোটি অতি চমৎকার ছেলে। যেমন স্বভাবচরিত্র, তেমনি লেখাপড়ায়।"

মাস্টারমশাই নির্ঘাত ভুল করেছেন। একজনের কথায়, আরেকজনের কথা বলছেন। সেজোকাকা বললেন, "ও, আপনি ছিরুর কথা বলছেন। সে আমার ভাইপো নয়, আমার ছোটো ভাইয়ের সম্বন্ধী।"

কথা শুনে মাস্টারমশাই হাসিতে ফেটে পড়লেন। বললেন, "কী! ছিরু ভালো ছেলে?"

মেজোকাকা বললেন, "কেন, ছিরুই তো ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে।"

মাস্টারমশাই অবাক হয়ে বললেন, "আপনি বলেন কী! সে কি প্রাইজ পাওয়ার ছেলে? ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে আপনার ভাইপো ভূদেব।"

আচ্ছা, তাহলে প্রাইজের বইগুলোর লেবেলে পর্যন্ত ভূদেবের বদলে ছিরুর নাম কেন?

ব্যাপারটা সবিস্তারে বলতে হলে গোড়ায় যেতে হয়। অর্থাৎ ইশকুলে যেদিন প্রাইজ দেওয়া হয়েছে, সেদিনের কথায় যেতে হয়।

সেদিন প্রাইজের পর ছিরু ফিরতি পথে ভূদেবকে বলল, "দ্যাখো, তুমি বাড়ির একমাত্র ছেলে, তুমি প্রাইজ না পেলে তোমাকে আর কে কী বলবে? বড় জোর একটু বকুনি দেবে। কিন্তু আমি প্রাইজ পাইনি জানলে আমায় আর বাড়িতে রাখবে না, দূর করে দেবে।"

বিশ্রী ব্যাপার হয় সেটা। কোনও উপায় নেই?

ছিরু ভূদেবকে বলল, "একটা উপায় আছে। তোমার প্রাইজের বইগুলো আমাকে দাও, প্রাইজটি যেন আমি পেয়েছি।"

ভূদেব এককথায় প্রাইজের বইগুলো ছিরুকে দিয়ে দিল।

কিন্তু প্রাইজের বইয়ে তো ভূদেবের নামে লেবেল লাগানো আছে, সেদিকে কী হবে? ছিরু বলল, "দ্যাখো, আমি সব ঠিক করছি।"

ছিরু গুণধর ছেলে। বই থেকে ভূদেবের নাম-লেখা লেবেল ছিঁড়ে ফেলে দিল, তার বদলে একটা দোকান থেকে নতুন কাগজ এনে নিজের নামে লেবেল লিখে বইয়ে সেঁটে দিল। একেবারে নিখুঁত কাজ।

কাজ যতই নিখুঁত হোক, শেষরক্ষা হয়নি। সব খবর শুনলেন ভূদেবের বাবা। ভূদেব যে ছিরুর জন্য স্বার্থত্যাগ করেছে, প্রাইজ পায়নি বলে ভূদেব যে অম্লান মুখে বাড়ির সকলের গঞ্জনা নিঃশব্দে সয়েছে, এজন্য ভূদেবের বাবা খুব খুশি হলেন। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সেকথা ভূদেবকে জানতে দিলেন না। উপরন্তু ভূদেবের বাবা বাড়ির সকলকে বলে দিলেন, আমরা যে সবকথা জানতে পেরেছি, ভূদেব যেন তা টের না পায়।

ওয়াল্ট ডিজনির গল্পমালা

ডাইনোসর-চুরি

পাতা ওল্টাও

ডাইনোসর-চুরি

এর পর আগামী সংখ্যায়

বানাও

ফেলনা কাগজ খেলনা হয়

আরে, আরে, ও কী করছ? এমন সুন্দর রঙিন কাগজের টুকরোটাকে ফেলে ছড়িয়ে উড়িয়ে দিচ্ছ বাতাসে? কী বললে. বাজে কাগজ? আমি কিন্তু মোটেই মানলুম না কথাটা। তোমরা যদি সেই মজার খেলাটা জানতে, যার নাম অরিগামি, তাহলে বুঝতে ঐ বাজে কাগজটাও কত কাজের। ফেলনা কাগজ থেকেও খেলনা বানানো যায় কত রকম।

অরিগামি ভারী মজার খেলা। খরচা-পাতি নেই এক পয়সাও। শুধু কাগজের একটু টুকরো আর হাত আর কাগজটাকে ভাঁজ করার কায়দা-কানুন, ব্যাস। তারপর সেই কাগজই কখনো হয়ে উঠবে বনের পাখি, জলের নৌকো, দিঘির হাঁস. পুকুর-পাড়ের কোলা ব্যাঙ, আমের মুকুলের চারপাশে উড়ে বেড়ানো মৌমাছি, পেখম-মেলা ময়ূর, ল্যাজ-নাড়ানো বাঁদর, এমনি আরও কত কী।

এই খেলাটা কোথায় জন্মেছে জানো? জাপানে। রঙিন কাগজ নিয়ে নানা-রকম নকশা বানানো অনেককাল আগে থেকেই এশিয়ার মানুষ জানত। জাপান সেটাকে নিয়ে আরও চর্চা করে। জার্মানি দেশটার নাম তোমরা জানো। সেই দেশে গত শতাব্দীতে ফ্রেডরিক ফ্রয়বেল নামে একজন লোক যখন কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে ছোটদের লেখা-পড়া শেখানো শুরু করলেন. তখন এই অরিগামি খেলাটাও ঢুকে পড়ল তার মধ্যে। এখন সারা পৃথিবীর সব দেশের ছেলে-মেয়েদের কাছে এটা একটা দারুণ প্রিয় খেলা। খেলতে-খেলতে শেখা যায় অনেক কিছু। আবার খেলনাটাকে উপহারও দেওয়া যায় বন্ধু-বান্ধবের জন্মদিনে। ছোটদের কথা বাদই দিলাম। বড়ো মানুষও কি কম মজা পায় নাকি এই খেলায়? স্পেন দেশে একজন মস্ত বড় দার্শনিক ছিলেন। নাম উনামুনো। অরিগামি ছিল তাঁর অবসর সময়ের একমাত্র নেশা। একটু শিখলে তোমাদেরও অমনি নেশায় ধরবে।

এবারে শুধু কাগজ ভাঁজ করার পদ্ধতিটা শেখাচ্ছি। পরের বারে একটা আস্ত কিছু বানিয়ে দেব। কেমন?

পূর্ণেন্দু পত্রী

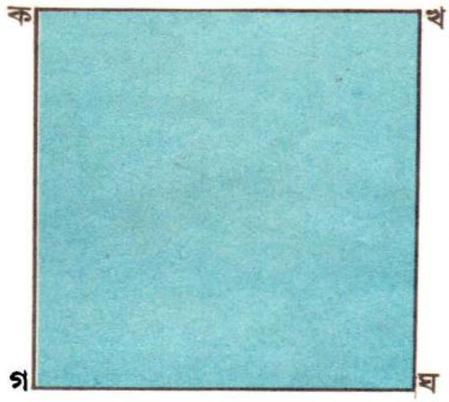

ক খ গ ঘ একটি চৌকো কাগজের চারটে কোণ। এটাকে যদি কোণাকুণি ভাঁজ করো. কী হবে? একটা ত্রিভুজ। ২ নম্বর নকশার মত।

এই ত্রিভুজে ঘ কোণটা নেই। মিশে গেছে গ-তে। এটাকে যদি আবার ভাঁজের দাগ দেখে ভাঁজ করো, কী দাঁড়াবে? আবার একটা ত্রিভুজ। ৩ নম্বর নকশার মত।

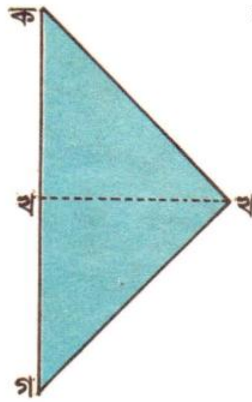

আচ্ছা, এবার এই ত্রিভুজটা যেমন আছে তেমনি থাকবে। অথচ এর গায়ে উড়ে এসে জুড়ে বসবে একটা চতুর্ভুজ, বানাতে পারবে? শুনেই ভাবছ, তাই আবার হয় নাকি? হয় কিন্তু। ভাঁজের কৌশল জানলেই হয়। অরিগামির আসল মজা তো ঐটেই। ৪ নম্বর নকশাটা দ্যাখো।

ত্রিভুজটাকে মাঝখান দিয়ে আর-একবার ভাঁজ করে নিলাম, ভাঁজের দাগ ধরে। তাতে তৈরী হল একটা নতুন কোণ। নাম দিলাম ঘ। এবার ভাঁজটাকে খুলে দিলাম। অর্থাৎ যেমন ছিল গোড়ায়, তেমনি। এবার তাকাও ৫ নম্বর নকশার দিকে।

ক খ গ ত্রিভুজের ক আর খ-র মাঝখানে ঘ রয়েছে যেখানটায়, তার পেটের ভিতরে আঙুল চালিয়ে টেনে নিয়ে এস নীচের দিকে। ঘ-টা নীচে এল; ঘ-র আগের জায়গাটা এখন ফাঁকা। সেটার নতুন নাম দিলাম ঙ। এখন দেখ, একই সঙ্গে ক খ গ একটা ত্রিভুজ; আর ঙ গ খ ঘ একটা চতুর্ভুজ। মজার কাণ্ড, তাই না?

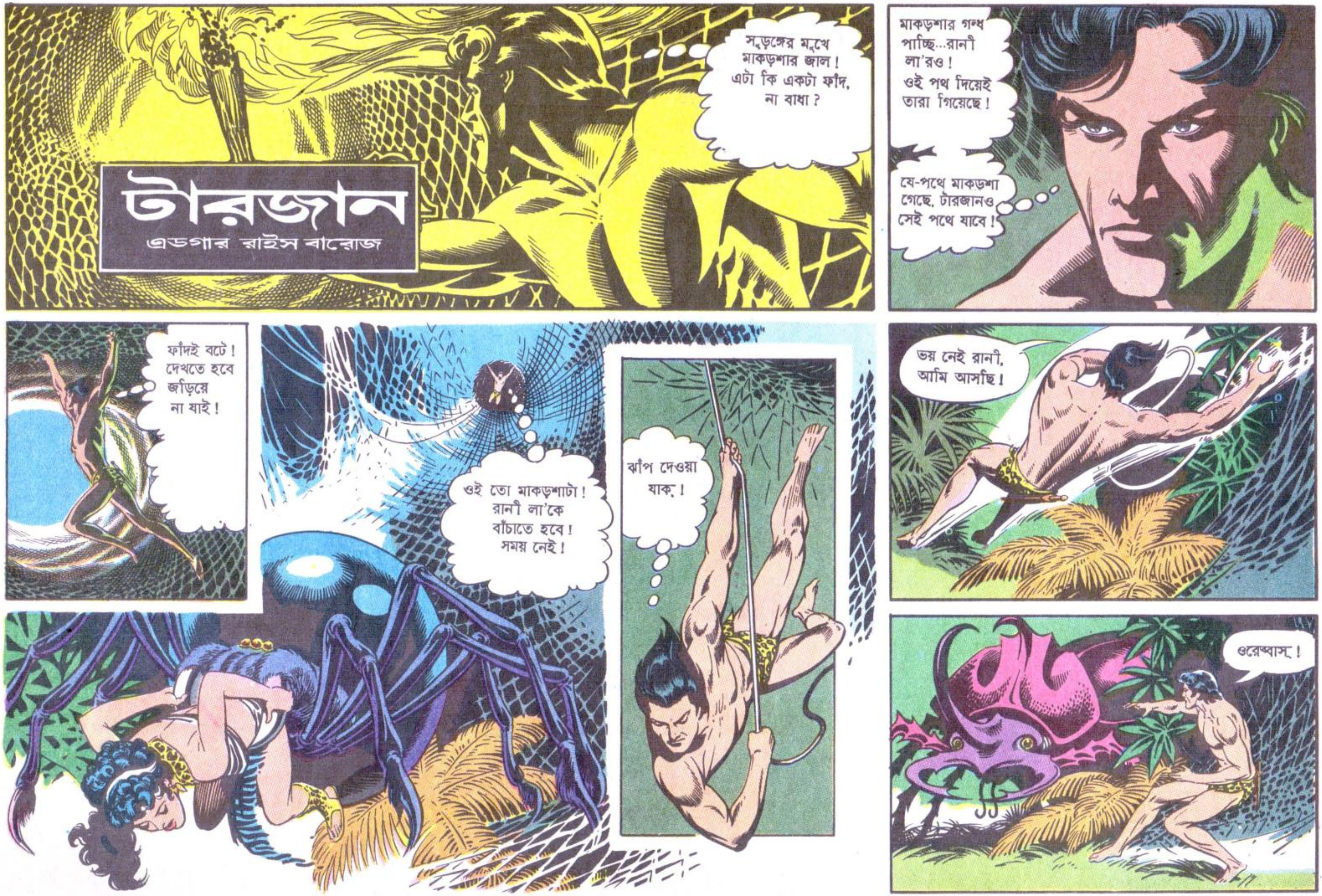
টারজান
এডগার রাইস বারোজ
সুড়ঙ্গের মুখে মাকড়শার জাল! এটা কি একটা ফাঁদ, না বাধা?
মাকড়শার গন্ধ পাচ্ছি...রানী লা'রও! ওই পথ দিয়েই তারা গিয়েছে!
যে-পথে মাকড়শা গেছে, টারজানও সেই পথে যাবে!
ফাঁদই বটে! দেখতে হবে জড়িয়ে না যাই!
ওই তো মাকড়শাটা! রানী লা'কে বাঁচাতে হবে! সময় নেই!
ঝাঁপ দেওয়া যাক্!
ভয় নেই রানী, আমি আসছি!
ওরেব্বাস্!

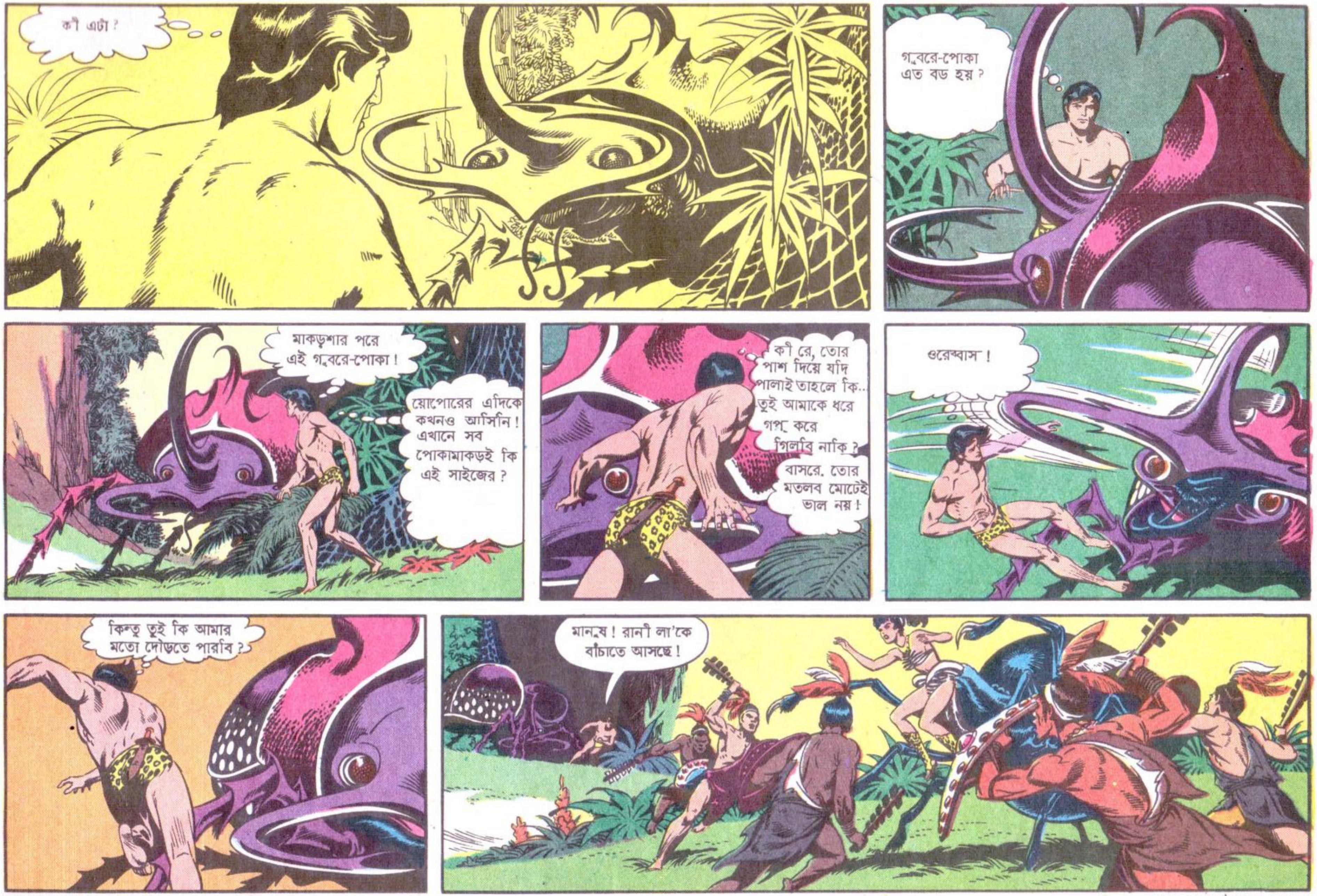

এর পর আঠারোর পাতায়

মহাভারতের গল্প

দ্রোণাচার্যের প্রতিজ্ঞাপূরণ

অমিতা চক্রবর্তী

তোমরা জানো যে, কৌরব ও পান্ডব রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষার গুরু ছিলেন মহর্ষি দ্রোণ। কিন্তু ঋষিমশাই জপতপ ফেলে রেখে হঠাৎ কেন রাজকুমারদের যুদ্ধবিদ্যায় পটু করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন, তা হয়তো তোমরা অনেকে জানো না। আসলে এই বৃত্তি গ্রহণের পিছনে আছে তাঁর জীবনের এক অপমানজনক ঘটনা। পাঞ্চালদেশের রাজা দ্রুপদ ও ভরদ্বাজ মুনির ছেলে দ্রোণ অগ্নিবেশ নামে একই গুরুর কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল গভীর বন্ধুত্ব। দ্রুপদ একদিন দ্রোণকে বলে বসলেন, "আমি বড় হয়ে রাজা হলে তোমাকে অর্ধেক ভাগ দেব।" এই প্রতিশ্রুতির কথা দ্রোণের মনে রইল। যাই হোক, শিক্ষা শেষ হলে দ্রোণ ফিরে গেলেন তপোবনে, আর দ্রুপদ হলেন পাঞ্চালদেশের রাজা।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। একদিন দ্রোণের ছেলে অশ্বত্থামা দুধ খাওয়ার বায়না ধরেছে, কিন্তু গরিব ব্রাহ্মণ দ্রোণ হঠাৎ দুধ কোথায় পান? তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হল দুধের খোঁজে। এদিকে কতগুলি ছেলে মিলে খানিকটা পিটুলিগোলা এনে অশ্বত্থামাকে দিলে মহানন্দে সে তা-ই গলাধঃকরণ করতে লাগল। দুধ না পেয়ে হতাশ দ্রোণ ফিরে এসে দেখলেন এই দৃশ্য। রাগে ও দুঃখে অধীর হয়ে তিনি রওনা দিলেন বাল্যসখা রাজা দ্রুপদের উদ্দেশে। কিন্তু অহংকারী দ্রুপদ আগেকার সেই শপথের কথা স্বীকারই করলেন না। উলটে আরও দ্রোণের প্রতি অবজ্ঞা করে বললেন, "বন্ধুত্ব হয় সমানে-সমানে। তোমার মত নির্ধনের সংগে আমার মত রাজার আবার বন্ধুত্ব কিসের? তবে দয়া করে শুধু আজ রাত্রির মত তোমায় খেতে দিতে পারি।" শুনে দ্রোণের খুব রাগ হল। তিনি ঠিক করলেন এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে হবে। দ্রুপদকে পরাজিত করে তার দর্প চূর্ণ করতে হবে। যোগ্য সহায় পাওয়ার জন্যে তিনি পথে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর এসে উপস্থিত হলেন কুরুকুলের রাজধানী হস্তিনাপুরে।

একদিন কৌরব ও পান্ডব কুমারেরা রাজধানীর বাইরে একটি লোহার গুলি নিয়ে খেলছিলেন, হঠাৎ সেটি গড়িয়ে পড়ে গেল এক কুয়োর মধ্যে। কুয়োটি শুকনো হলেও খুবই গভীর। কী করে অত নিচু থেকে ছোট্ট বলটিকে তুলে আনা যায়? ভেবে-ভেবে তাঁরা যখন কূলকিনারা পাচ্ছেন না, তখন দেখতে পেলেন শ্যামবর্ণ বয়স্ক এক ব্রাহ্মণকে। রাজপুত্রদের উপহাস করে ব্রাহ্মণ বললেন, "ভরতবংশে জন্মেও এই সহজ কাজটা তোমরা পারছ না? দ্যাখো, কত সহজে আমি এই গুলিটি তুলে দিচ্ছি।" বলে একটি 'ঈষিকা' অর্থাৎ নলঘাসের শক্ত কাঠি তুলে নিয়ে যেই ছুঁড়লেন অমনি তার ধারালো ডগাটি গিয়ে বিঁধে গেল লোহার বলে। পর পর দ্রোণ অনেকগুলি কাঠি ছুড়তে থাকলেন, একটির পেছনে আর-একটি আটকে যেতে লাগল। এবার শেষ কাঠিটি ধরে অনায়াসে দ্রোণ তুলে ফেললেন সেই ছোট্ট বলটিকে। নিজের আংটিও কুয়োর মধ্যে ফেলে তারপর বাণ মেরে সেটিকে তুলে এনে দিলেন তিনি। কুমারেরা তো হতবাক্! লক্ষ্যভেদবিদ্যায় কতখানি দখল থাকলে তবে এমন অসাধ্য সাধন সম্ভব! কে এই অসাধারণ শক্তিমান পুরুষ? তাঁরা তক্ষুনি দৌড়ে গিয়ে পিতামহ ভীষ্মকে সব বললেন। ভীষ্ম বুঝতে পারলেন, ইনি নিশ্চয় মহর্ষি দ্রোণ! সসম্মানে তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসে রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষার গুরুরূপে নিযুক্ত করলেন তিনি।

দুর্যোধনেরা একশো ভাই ও পান্ডবেরা পাঁচ ভাই। সকলেরই নিয়মিত শিক্ষা চলতে লাগল দ্রোণাচার্যের কাছে। কিন্তু সবচেয়ে পটু হয়ে উঠলেন অর্জুন। তাঁর সাধনা ও একাগ্রতা সবাইকে ছাড়িয়ে গেল। একদিন গুরু ঠিক করলেন, লক্ষ্যভেদে শিষ্যদের কেমন দক্ষতা জন্মেছে তার পরীক্ষা নিতে হবে। কাঠের একটা নীল পাখি তৈরী করিয়ে তিনি ঝুলিয়ে দিলেন গাছের মগডালে। শিষ্যদের একে একে ডেকে পাঠালেন; বললেন, তীর মেরে কেটে ফেলতে হবে পাখির মাথাটি। প্রথমে ডাক পড়ল বড় ভাই যুধিষ্ঠিরের। লক্ষ্য স্থির করার পর দ্রোণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী কী দেখছ?" যুধিষ্ঠির জানালেন, "গাছ, পাখি, নীচে আপনাকে ও ভাইদের সকলকেই দেখতে পাচ্ছি।" গুরু বুঝলেন এখনও লক্ষ্য স্থির হতে অনেক দেরি। একে-একে সব রাজপুত্রেরই পালা এল, কিন্তু কেউই গুরুর মনোমত উত্তর দিতে পারলেন না। সবশেষে ডাক পড়ল অর্জুনের। প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, "শুধুমাত্র পাখির মাথাটিই তাঁর চোখে পড়ছে।" শুনে সন্তুষ্ট হলেন দ্রোণ। আদেশ দেওয়া মাত্রই অর্জুনের তীর ছুটে গিয়ে পাখির মাথাটিকে বিচ্ছিন্ন করে দিল।

আর একদিন শিষ্যদের নিয়ে দ্রোণ নদীতে স্নান করতে গেছেন। হঠাৎ একটা কুমির এসে তাঁর পায়ে কামড়ে ধরল। দ্রোণ ইচ্ছে করলেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু শিষ্যদের পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে অসহায়ের মত আর্তনাদ করতে লাগলেন। অন্য শিষ্যরা সব হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন; অর্জুন কিন্তু একাই এগিয়ে এসে পাঁচটি বাণ মেরে খন্ড খন্ড করে দিলেন কুমিরের শরীর। দ্রোণ মুক্ত হয়ে খুশীমনে অর্জুনকে আশীর্বাদ করলেন, তারপর উপহার দিলেন 'ব্রহ্মশির' নামে এক মহাস্ত্র। এইভাবে নিজের যোগ্যতায় অর্জুন হয়ে উঠলেন গুরুর সবচেয়ে প্রিয়পাত্র।

ক্রমশ বড় হয়ে উঠলেন কুমারেরা। সকলেই শক্তি-সামর্থ্যে, রূপে গুণে অতুলনীয়। দ্রোণ ঠিক করলেন এবার সকলের সামনে শিষ্যদের অস্ত্রবিদ্যায় যোগ্যতার পরিচয় দেওয়া হবে। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও রাজী। বিদুরের ব্যবস্থাপনায় তৈরী হতে লাগল বিরাট রঙ্গভূমি—অনেকটা যেন এখনকার স্টেডিয়াম। একদিকে দর্শকদের বসার সুসজ্জিত আসন, পুরনারীদের জন্যে মঞ্চ; সামনে উন্মুক্ত স্থান, সেখানে কুমারেরা তাঁদের

অস্ত্রনৈপুণ্য দেখাবেন। অবশেষে এসে গেল সেই নির্দিষ্ট দিনটি। রঙ্গভূমি ভরে গেল জনতায়। রাজ-পরিবারের মহিলারাও তাঁদের নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, তাই তাঁর কাছে রয়েছেন বিদুর, খেলার 'ধারা-বিবরণী' শোনানোর জন্যে। বাজনার শব্দ, দর্শকদের কোলাহল—সব মিলিয়ে জায়গাটি জমজমাট। রঙ্গক্ষেত্রে প্রথমে প্রবেশ করলেন শুভ্রবেশ শুভ্রকেশ মাল্যচন্দনভূষিত আচার্য দ্রোণ। সঙ্গে পুত্র অশ্বত্থামা। স্তব্ধ হয়ে গেল সকলে। তাঁর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এসে গেলেন রাজকুমারেরা। দু দলে ভাগ হয়ে তাঁরা শুরু করলেন নকল যুদ্ধ। তাঁদের সৌন্দর্য ও বীরত্বে দর্শকেরা চমৎকৃত। এ ছাড়া মল্লযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, রথচালনা ইত্যাদি নানা বিদ্যায় নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন তাঁরা। তারপর ভীম ও দুর্যোধন গদা হাতে নেমে পড়লেন আসরে। খেলা দেখাতে দেখাতে দুজনে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। দর্শকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল এই উত্তেজনা। তারাও দু দলে ভাগ হয়ে গেল। একদল ভীমকে, আরেক দল দুর্যোধনকে সমর্থন করতে লাগল। বিপদের আশঙ্কায় দ্রোণ তক্ষুনি পাঠিয়ে দিলেন অশ্বত্থামাকে। তাঁর চেষ্টায় তখনকার মত বিরোধ থামল। এবার দ্রোণ এগিয়ে এসে ঘোষণা করলেন, "এখন আসছেন মহাবীর অর্জুন, যিনি নিজের যোগ্যতার গুণে আমার পুত্রেরও অধিক স্নেহভাজন।" যোদ্ধার বেশে প্রবেশ করলেন অর্জুন। তাঁর বীরোচিত আকৃতি দেখে দর্শকেরা মুগ্ধ। পঞ্চমুখে তারা তাঁর গুণগান করতে থাকে। অর্জুন শুরু করলেন তাঁর দক্ষতার প্রদর্শনী। প্রথমে অগ্নিবাণ মেরে সৃষ্টি করলেন আগুনের বেড়াজাল, তারপর বরুণবাণে বৃষ্টি ঝরিয়ে নিবিয়ে দিলেন সেই লেলিহান শিখা। এক বাণে সৃষ্টি করলেন পর্বত, আবার বাণের কৌশলেই নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন ভূমির ভিতর। ছুটন্ত বরাহের মুখের ভিতরদিকে বিঁধিয়ে দিলেন পাঁচটি বাণ। এইরকম নানা আশ্চর্য কৌশল দেখিয়ে যখন তিনি অভিভূত করে ফেলেছেন সকলকে, তখন বাইরে শোনা গেল এক বীরের হুঙ্কার। তিনি সদর্পে আস্ফালন করে অর্জুনের প্রায় সব খেলাই দেখিয়ে দিলেন। এমন কী অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও এগিয়ে এলেন। দুর্যোধন তো মহাখুশী। পাণ্ডবদের ওপর তাঁর রাগ বহুদিনের। সাদরে তিনি বরণ করে নিলেন এই নবাগতকে। কিন্তু কে এই অজ্ঞাতপরিচয় যোদ্ধা? রাজপুত্ররা তো যে-সে লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন না। মর্যাদায় যে সমান, একমাত্র তার সঙ্গেই তো যুদ্ধ হয়। এই আপত্তি ওঠামাত্র দুর্যোধন তাঁকে অভিষিক্ত করে নিলেন অঙ্গরাজ্যের রাজা হিসাবে। পালক পিতা সূত অধিরথ এগিয়ে এলে আগন্তুক বীর তাঁকে প্রণাম করলেন। বোঝা গেল, ইনি মহাবীর কর্ণ। কিন্তু ঠিক এই সময়েই সূর্য গেল অস্তাচলে, সাঙ্গ হল সেদিনের কার্যসূচী। তখনকার মত মুলতবী রইল কর্ণ ও অর্জুনের শক্তিপরীক্ষা।

শিষ্যদের প্রস্তুতির পালা শেষ, এবার দ্রোণ চাইলেন তাঁর গুরুদক্ষিণা। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে বন্দী করে আনতে হবে। সসৈন্যে গিয়ে রাজকুমারেরা সকলে পাঞ্চাল রাজ্যের সীমানায় শিবির স্থাপন করলেন। প্রথমে এগিয়ে গেলেন দুর্যোধন ও তাঁর ভাইয়েরা। দ্রুপদও দারুণ শক্তিশালী। দুই পক্ষেই চলল ভীষণ যুদ্ধ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৌরবেরা বিতাড়িত হয়ে ফিরে এলেন। এবার এগিয়ে গেলেন ভীম ও অর্জুন। তাঁদের দুজনের বীরত্বেই বিধ্বস্ত হল দ্রুপদের বিশাল বাহিনী। অর্জুন বন্দী করে ফেললেন দ্রুপদকে, তারপর তাঁকে নিয়ে এলেন গুরুর কাছে। এখন দ্রুপদই দ্রোণের শরণার্থী। দ্রোণ বললেন, "তুমি একদিন বন্ধুত্বের অঙ্গীকার অস্বীকার করেছিলে—আজ কিন্তু আমি সেই প্রতিশ্রুতি মনে রেখে তোমাকে অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে দিচ্ছি। ভাগীরথীর দক্ষিণ অঞ্চল পর্যন্ত তোমার রাজ্য হোক, উত্তরাঞ্চল থাকবে আমার অধিকারে।" এইভাবে অর্জুনের সহায়তায় দ্রোণ হলেন অহিচ্ছত্রপুরীর অধীশ্বর—পূর্ণ হল দ্রুপদের দর্প চূর্ণ করার প্রতিজ্ঞা।

জানো নিশ্চয়?

ইলিশ

ইলিশ মাছ তো সবাই খেয়েছ। কিন্তু এটা জানো কি, নদীতে ধরা পড়লেও ইলিশের ঘরবাড়ি আসলে সমুদ্রে? ইলিশ খেতে ভাল, দেখতেও ভাল। বিলিতি স্যাড মাছের সঙ্গে এর মিল আছে। গঙ্গা ও পদ্মার ইলিশ সবচাইতে ভাল। তবে ইলিশ পাওয়া যায় ভারতের প্রায় সব জায়গাতেই। সিন্ধু নদীতে যে ইলিশ পাওয়া যায়, তার নাম —পাল্লা।

যে কথা বলছিলাম, ইলিশ জন্মায় নদীতে, বড় হয় সমুদ্রে, আবার ধরা পড়ে নদীতে—নিজেদের জন্মস্থানে। ব্যাপারটা খুলে বলি, ইলিশের ডিম ছাড়বার সময় হলেই তারা ঝাঁকে-ঝাঁকে স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটে নদীর ভিতরে চলে আসে। তারপর সুবিধেমতো জায়গায় নদীর মিষ্টি জলে এবং যেখানে স্রোত তেমন তীব্র নয়, সেখানে ডিম ছাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। বাচ্চাগুলি মাসখানেক জন্মস্থানে থেকে স্রোতে ভেসে সমুদ্রে চলে যায়। খুব গভীর সমুদ্রে নয়। প্রায় দু বছর সমুদ্রে থাকে। খায়-দায়, ঘুরে বেড়ায়। এমনি করে বড় হয়। তারপর ওদেরও ডিম ছাড়ার সময় আসে। তখন আবার উজান ঠেলে চলে নদীতে। আর তখনই জেলেদের জালে ধরা পড়ে যায় ওরা—সবাই নয়, কেউ-কেউ।

রানী লা! ভয় নেই! ওরা তোমাকে বাঁচাবে!
টারজান! এই বীভৎস জন্তুটার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও!
আসছি রানী লা!
বড় গুবরে-পোকার উপরে ছোট গুবরে-পোকা! হাতে বর্শা! ব্যাপার কী?
মানুষগুলোকে ওরা মেরে হটাচ্ছে! গুবরে-পোকার বর্মের আড়ালে ওরাও মানুষ নয় তো?
রানী লা'কে ছেড়ে দিতে ওরা মাকড়শাটাকে বাধ্য করল!
টারজান! বাঁচাও!
ছেড়ে দাও ওকে!

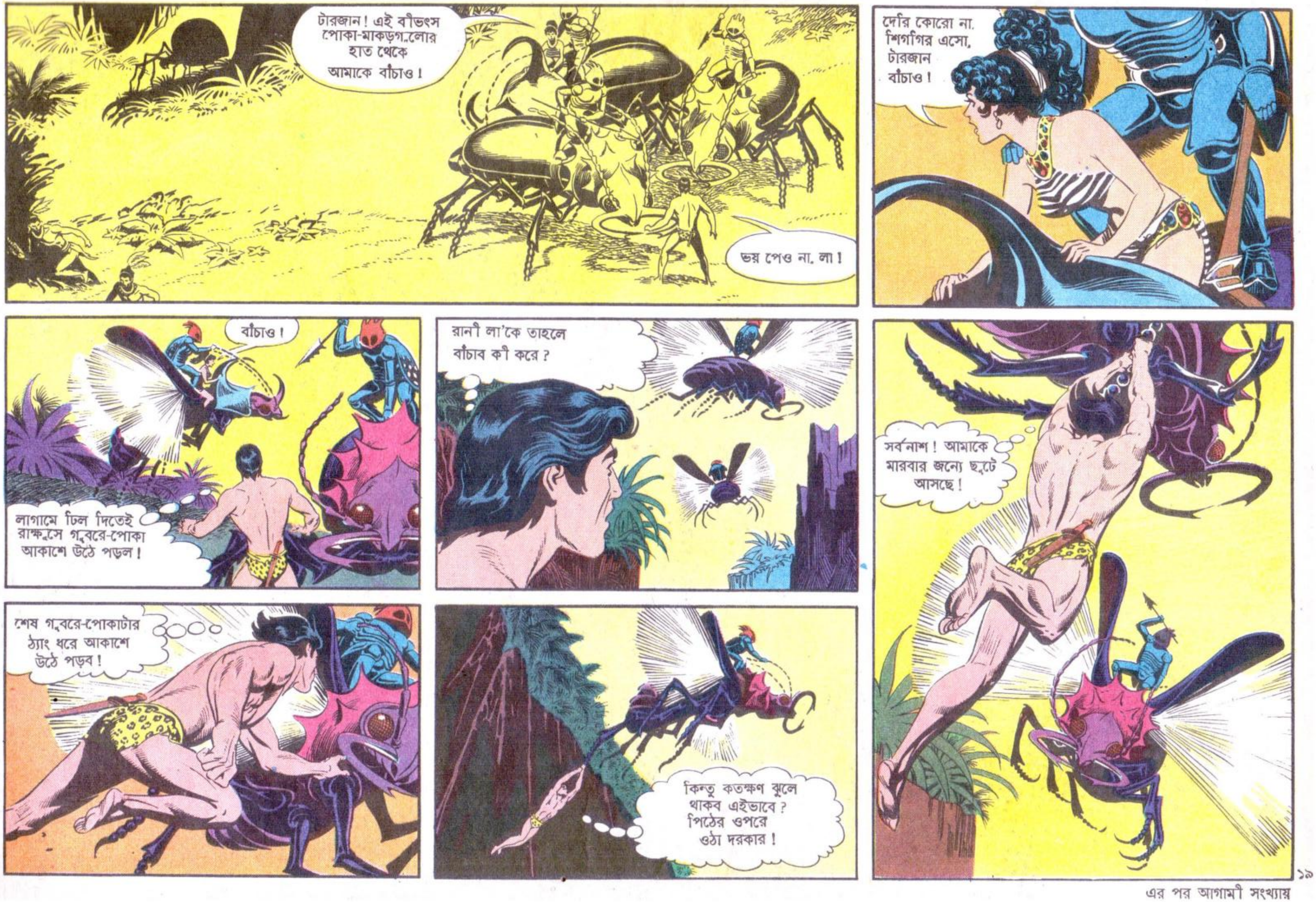

এর পর আগামী সংখ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সবুজ দ্বীপের রাজা

আগে যা ঘটেছে

'ভয়ংকর সুন্দর'-এর সেই সন্তু আর তার কাকাবাবু আবার বেরিয়ে পড়েছে নতুন অভিযানে। দমদম থেকে ওরা চেপেছে প্লেনে। কোথায় যাওয়া হবে সন্তু তখনো জানে না। কলকাতায় পাসপোর্ট অফিসের সামনে যে-সাহেবটি সন্তুকে ধাক্কা মেরেছিল, সেই সাহেবটিকেই দেখা গেল ঐ প্লেনে, অন্যরকম পোশাকে। প্লেন রেঙ্গুন ছুঁয়ে আবার উড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত এসে থামল আন্দামানে। সেখানে—

৩

আন্দামানের নাম শুনে সন্তু ভেবেছিল একটা নোংরা-মতন বিচ্ছিরি দ্বীপ দেখবে। যে-জায়গায় এক সময় শুধু চোর-ডাকাত আর কয়েদীদের পাঠানো হত, সে জায়গা তো আর সুন্দর হতে পারে না! আগেকার দিনে অনেকেই নাকি আন্দামানে একবার গেলে আর জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারত না। সেই জায়গায় কেউ শখ করে যায়?

কিন্তু প্লেনটা যখন ঘুরে ঘুরে নামতে লাগল, তখন জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে সন্তু একেবারে অবাক হয়ে গেল। ছবির বই ছাড়া এমন সুন্দর দৃশ্য সন্তু আগে কখনো দেখেনি। পুরী কিংবা দীঘার সমুদ্রে সে দেখেছে ঘোলাটে ধরনের জল। এখানে সমুদ্রের জল একেবারে গাঢ় নীল রঙের। এত গাঢ় যে, মনে হয় কলম ডুবিয়ে অনায়াসে লেখা যাবে। তার মাঝখানে ছোট-ছোট দ্বীপ। আন্দামান তো একটা দ্বীপ নয়—সন্তুই গুনে ফেলল এগারোটা। পরে শুনেছিল, ওখানে দুশোর বেশী দ্বীপ আছে।

প্রত্যেকটা দ্বীপেই ছোট-ছোট পাহাড় আছে, আর সেই পাহাড়ে গিসগিস করছে গাছপালা। এত গভীর বন যে পৃথিবীতে এখনো আছে, ভাবাই যায় না। মনে হয় যেন ওর মধ্য দিয়ে হাঁটাই যাবে না। বিরাট বিরাট গাছ। সেই নীল রঙের সমুদ্রের মধ্যে সবুজ সবুজ দ্বীপ, দ্বীপগুলোর ধারে ধারে ঢেউ এসে ভেঙে পড়ে ধপধপে সাদা ফেনা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বেশির ভাগ দ্বীপেই একটাও বাড়িঘর নেই। তারপর একটা বড় দ্বীপে কিছু-কিছু বাড়ি চোখে পড়ল। প্লেনটা সেখানেই নামছে। এই জায়গাটার নামই পোর্ট ব্লেয়ার। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেনটা মাটি ছুঁতেই সন্তু তার কাকাবাবুর দেখাদেখি কোমর থেকে সীট বেল্ট খুলে ফেলল। কান দুটো কী রকম যেন ভোঁভোঁ করছে। মাঝে মাঝেই পুচ্‌পুচ্‌ করে একটু হাওয়া বেরিয়ে আসছে কানের ভেতর থেকে। বাইরের শব্দ কিংবা ভেতরের অন্যদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে খুব আস্তে। বেশ মজাই লাগছে সন্তুর।

অন্যরা নামতে শুরু করতেই সন্তু তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল। কাকাবাবু নামলেন সবার শেষে। কাকাবাবুকে ক্রাচে ভর দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয় খুব সাবধানে। সন্তু একটু লজ্জা পেল। আগে আগে না এসে তার উচিত ছিল কাকাবাবুকে একটু সাহায্য করা। কিন্তু সে আবার সিঁড়ির কাছে যাবার আগেই কাকাবাবু নেমে পড়েছেন।

একজন গোলগাল বেঁটেমতন লোক এগিয়ে এসে কাকাবাবুর হাত ছুঁয়ে বলল, "আপনিই নিশ্চয় মিস্টার রায়-চৌধুরী? আমি দাশগুপ্ত। আপনার জন্য গাড়ি নিয়ে এসেছি।"

কাকাবাবু সন্তুকে দেখিয়ে বললেন, "এটি আমার ভাইপো। এর নাম সুনন্দ রায়চৌধুরী, ডাকনাম সন্তু।"

দাশগুপ্ত নামের লোকটি সন্তুর পিঠে হাত দিয়ে বলল, "বেড়াতে এসেছ তো? ভালো লাগবে, দেখো খুব ভালো লাগবে!"

কাকাবাবু দাশগুপ্তকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "ঐ যে দুজন বিদেশী সাহেব, ওদের দিকে একটু নজর রাখতে হবে। ওরা কোথায় যায়, কোথায় ওঠে—"

দাশগুপ্ত একটু অবাক হয়ে বলল, "এই প্লেনে তো বিদেশী কেউ আসছে না! আমরা আগে থেকেই খবর পাই।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে ঐ দুজন?"

"ওরা নিশ্চয়ই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। এখানে একটা দেশ-লাইয়ের কারখানা আছে। সেখানে কিছু অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কাজ করে। মাঝে-মাঝে ওদের যাতায়াত করতে হয় কলকাতায়—"

"তবু, ওরা কোথায় থাকবে, সেটা আমি জেনে রাখতে চাই।"

দাশগুপ্ত এবার হেসে বলল, "সে ঠিক জানা যাবে। এটা খুব ছোট জায়গা, এখানে সকলের সঙ্গেই সকলের দেখা হয়ে যায়। ওরা নিশ্চয়ই দেশলাই কারখানার কোয়ার্টারেই থাকবে।"

কাকাবাবু আড়চোখে সাহেব দুটির দিকে লক্ষ করতে লাগলেন। লোক দুটি এমনভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, যেন কারুকে খুঁজছে। কিন্তু ওদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কোনো লোক আসেনি। একটু বাদে ওরা নিজেরাই গট্‌ গট্‌ করে হেঁটে বেরিয়ে গেল।

মালপত্তর নিয়ে ওরা এয়ারপোর্টের বাইরে এসে একটা জিপ গাড়িতে চড়ল। কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের থাকার জায়গা ঠিক আছে তো?"

দাশগুপ্ত বলল, "হ্যাঁ, টুরিস্ট হোমে আপনাদের ঘর বুক করা আছে। সেটাই এখানকার সবচেয়ে ভালো জায়গা! খাওয়া-দাওয়ারও কিছু অসুবিধে হবে না। বেশ কিছুদিন থাকবেন তো?"

কাকাবাবু বললেন, "দেখি!"

প্লেন থেকে বোঝাই যায়নি যে দ্বীপের মধ্যে এরকম একটা শহর আছে। বেশ চমৎকার পীচ বাঁধানো রাস্তা, দুপাশে

নতুন-নতুন বাড়ি ও দোকানপাট। তবে রাস্তাটা পাহাড়ী শহরের মতন উঁচু-নিচু, আর মাঝে-মাঝেই হঠাৎ-হঠাৎ দূরে সমুদ্র দেখা যায়।

টুরিস্ট হোমটা একটা ছোট টিলার ওপর। আসবার পথে খানিকটা জঙ্গল পার হতে হয়। বাড়িটার সামনে অনেকখানি ফুলের বাগান। আর পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালেই সমুদ্র। খুব কাছে। এখানে অনেকগুলো ছোট ছোট জাহাজ আর স্টিমার রয়েছে। চমৎকার জায়গা। যে-কোনো দিকে তাকালেই চোখ জুড়িয়ে যায়।

একটা ডবল-বেড ঘর ঠিক করা ছিল সন্তুদের জন্য। একজন বেয়ারা ওদের মালপত্র পৌঁছে দিল ঘরে। কাকাবাবু তাকে এক টাকা বখশিস দিতে যেতেই সে লজ্জায় জিভ কেটে বলল, "নেহি! নেহি!"

কাকাবাবু আবার বললেন, "আরে নাও নাও, তোমার চা খাবার জন্য!"

লোকটি আরও লজ্জা পেয়ে মাথা নুইয়ে ফেলে বলল, "নেহি! নেহি! আপ রাখ দিজিয়ে।"

এ আবার কী রকম—হোটেলের বেয়ারা যে বখশিস নিতে চায় না? কাকাবাবু দাশগুপ্তকে জিজ্ঞেস করলেন, "এক টাকা বখশিস দিলে কম হয় নাকি? আরও বেশী চাইছে?"

দাশগুপ্ত বলল, "না, না, এরা বখশিস নিতে চায় না। দেখবেন, এখানকার লোক খুব ভালো—পয়সা-কড়ির দিকে কারুর লোভ নেই!"

লোকটির কালো কুচকুচে গায়ের রং। চেহারা দেখলেই মনে হয় দক্ষিণ ভারতীয়। অথচ হিন্দীতে কথা বলছে।

কাকাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী? তুমি বাংলা বোঝো?"

লোকটি বলল, "হাঁ সাব্, বাংলা বুঝি। আমার নাম কড়কড়ি!"

সন্তু অমনি ফিক করে হেসে ফেলল। কড়কড়ি আবার লোকের নাম হয় নাকি?

দাশগুপ্ত বলল, "সত্যিই ওর নাম কড়াকড়ি। এই যে, শোনো কড়কড়ি, সাহেবদের যত্ন-টত্ন করবে কিন্তু! ভালো খাবার-দাবার দেবে। আজ কী কী খাবার আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "মাছের ঝোল ভাত পাওয়া যাবে?"

দাশগুপ্ত বলল, "মাছ যত ইচ্ছে চাইবেন! এটা তো মাছেরই দেশ। এখানকার রাঁধুনী, বেয়ারা সবাই কেরালার লোক, ওরা আমাদেরই মতন মাছের ঝোল খায়। চিংড়ি মাছ পাবেন খুব ভালো। তাছাড়া, মুর্গী বা হরিণের মাংস—যেদিন যেটা ইচ্ছা হয় অর্ডার করবেন!"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, তাহলে তো চমৎকার ব্যবস্থা।"

দাশগুপ্ত তখনকার মতন বিদায় নিল। আবার সন্ধের সময় আসবে। সন্তু সুটকেসগুলো খুলে জামা-টামা সব বার করে গুছিয়ে রাখল। দুটো পাশাপাশি বিছানা, বেশ চওড়া খাট।

কাকাবাবু একটা খাটের ওপর বসে একটা ম্যাপ বিছিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন। সন্তু পেছনের দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। পেছনেও খানিকটা বাগান, তারপর পাহাড়টা খাড়া হয়ে নেমে গেছে, তার ঠিক নীচেই সমুদ্র। একটু দূরেই, বাঁ পাশে আর-একটা দ্বীপ। সেটা একেবারে জঙ্গলে ভরা। ঐ দ্বীপটায় একবার যেতেই হবে।

সন্তু দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ শুনতে পেল হাতির ডাক। পরপর দুবার। সে একেবারে শিউরে উঠল। এত কাছের ঐ দ্বীপটায় বুনো হাতি আছে? বাঘ-সিংহও আছে নিশ্চয়ই। এরকম একটা ভয়ংকর জঙ্গল এত কাছে? একটা দূরবীন থাকলে সে নিশ্চয়ই হাতিগুলোকে দেখতে পেত।

কিন্তু সন্তুর আর সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো হল না। কথা নেই বার্তা নেই, অমনি বৃষ্টি এসে গেল! প্রথমে মিহি বরফের গুঁড়োর মতন, তারপরই ঝমঝম। সন্তু দৌড়ে ফিরে এল নিজেদের ঘরে।

কাকাবাবু তখনও ম্যাপটা দেখছেন। সন্তু উত্তেজিত ভাবে বলল, "কাকাবাবু, কাকাবাবু, সামনের দ্বীপটায় না, হাতি আছে!"

কাকাবাবু মুখ না তুলেই বললেন, "তা তো থাকতেই পারে!"

"আমি হাতির ডাক শুনলাম। নিজের কানে, এক্ষুনি!"

"হুঁ।"

"ওখানে বাঘ বা সিংহ আছে?"

কাকাবাবু এবার মুখ তুলে বললেন, "না! আন্দামানে কোনো হিংস্র জন্তু নেই। ঐ হাতিগুলোও পোষা হাতি। বড়-বড় গাছ কাটা হয় তো, সেগুলো বয়ে নিয়ে যাবার জন্য হাতি লাগে। আমার চেনা এক ভদ্রলোক একবার কলকাতা থেকে পঞ্চাশটা হাতি নিয়ে এসেছিলেন এখানে।"

পোষা হাতির কথা শুনে সন্তু একটু দমে গেল। পোষা হাতি আর বুনো হাতি দেখা তো আর এক নয়! যাই হোক,

রিনিকে যখন সে চিঠি লিখবে, তখন লিখবে যে, সে বুনো হাতিরই ডাক শুনেছে। এত গভীর জঙ্গলের মধ্যে পোষা হাতিই বা দেখেছে কজন ?

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, ঐ লোকটিকে ডেকে এক কাপ চা দিতে বলো তো আমাকে। ভাত খাবার তো খানিকটা দেরি আছে!"

এইরে, লোকটার নাম কী যেন? একটু আগেই তো বলল, একদম মনে পড়ছে না! গড়াগড়ি? খড়খড়ি? সুড়সুড়ি? কাতুকুতু? না তো! ধরাধরি? মারামারি?

বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে সন্তু চেঁচিয়ে বলল, "এই যে, ইয়ে! একটু শুনে যাও তো!"

ভাগ্যিস তাতেই সাড়া দিল লোকটা। ডাইনিং রুমের পাশ থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "কী বলছেন, সাব?"

সন্তু তাকে চায়ের কথাটা জানিয়ে নিশ্চিন্ত হল। ওর নামটা কিন্তু এখনো মনে পড়ছে না!

আশ্চর্য, এর মধ্যেই বৃষ্টি থেমে গেছে। এ কী রকম ম্যালেরিয়ার জ্বরের মতন বৃষ্টি! আকাশে আর এক টুকরোও মেঘ নেই।

ভোরবেলা সন্তু ছিল কলকাতায় তার নিজের বাড়িতে। আর এখন এই দুপুরের মধ্যেই সে কোথায় চলে এসেছে! হঠাৎ যেন বিশ্বাসই করা যায় না। সত্যি কি সে আন্দামানের টুরিস্ট হোমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে? নাকি এটা স্বপ্ন? সন্তু নিজের হাতে একটু চিমটি কেটে দেখল, না, এটা স্বপ্ন নয়।

কাকাবাবুর আগে সন্তু স্নান করে নেবার জন্য বাথরুমে ঢুকল। সেখানে আবার এক অবাক কাণ্ড! শাওয়ার খুলে সে সবেমাত্র ওপর দিকে তাকিয়েছে, পাশের দেয়ালে দেখল একটা সবুজ রঙের টিকটিকি! প্রথমে সে ভেবেছিল সাপ বা অন্য কিছু। কিন্তু তা নয়। এমনিই একটি সাধারণ টিকটিকি। কিন্তু রংটা একদম সবুজ! টিকটিকিটা তাড়া করে আসছেও না, কিছুই না। শুধু তার দিকে চেয়ে আছে। সবুজ রঙের টিকটিকির কথা সে কারুর কাছে কোনোদিন শোনেনি। সে এতই অবাক হয়ে গেল যে, আর চেপে রাখতে পারল না। ভিজে গায়ে তোয়ালে পরেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "কাকাবাবু, কাকাবাবু, একটা অদ্ভুত জিনিস!"

সে এতই উত্তেজিত হয়ে বলল যে কাকাবাবু উপেক্ষা করতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি উঠে এলেন। টিকটিকিটা দেখে বললেন, "হুঁ, অদ্ভুতই বটে। এখানে এরকম আরও কিছু কিছু আছে, শুনেছি এখানে সাদা রঙের কুমির দেখতে পাওয়া যায়!"

সন্তু ভাবল, রিনিকে চিঠি লিখে চমকে দেবার আর একটা জিনিস পাওয়া গেল। গোয়াতে বেড়াতে গিয়ে ও কি এত সব নতুন জিনিস দেখতে পাবে!

সেদিন দুপুরে আর কোথাও বেরুনো হল না। খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম। এখানে সন্ধে হয় বেশ তাড়াতাড়ি। বিকেল হতে না হতেই সন্ধে।

সন্ধের সময় দাশগুপ্ত এল, তার সঙ্গে যাওয়া হল বাজারের দিকে। পোর্ট ব্লেয়ার বেশ আধুনিক শহর। এখানে টেলিফোন করে ডাকলেই ট্যাক্সি এসে যায়। বাজারে সবরকম জিনিসই কিনতে পাওয়া যায়। অবশ্য সে-সব জিনিস কলকাতা কিংবা মাদ্রাজ থেকে আনা।

শহরে নানারকম লোক। বাঙালী, মাদ্রাজী, কেরালার লোক, পাঞ্জাবী, বিহারী, বর্মী। তবে বাঙালীই যেন বেশী মনে হয়। কিছু লোক আছে, যারা আগেকার কয়েদীদের বংশধর। তবে, দাশগুপ্ত বলল, এখানে এখন চুরি ডাকাতি একদম হয় না।

রাস্তার পাশে-পাশে মাঝে-মাঝে বড়-বড় ব্যারাক বাড়িতে দেখা যায় কিছু চীনে মেয়ে-পুরুষ। তাদের নোংরা নোংরা জামা, কী রকম রাগ-রাগ চোখে তারা তাকায়।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "দাশগুপ্ত, এরাই বুঝি সেই তাইওয়ানিজ?"

দাশগুপ্ত বলল, "হ্যাঁ সার!"

সন্তু ঠিক বুঝতে পারল না। সে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, তাইওয়ানিজ মানে কী?"

কাকাবাবুর বদলে দাশগুপ্তই বলল, "তাইওয়ান বলে চীনেদের একটা ছোট্ট দেশ আছে। তাদের সঙ্গে আমাদের দেশের সম্পর্ক নেই। সেই দেশ থেকে মাঝে মাঝে সাত আটজন লোকসুদ্ধু এক-একটা মাছ ধরা নৌকো এখানে ভেসে চলে আসে। তাই তাদের ধরে আটকে রাখতে হয়!"

"কেন, তারা মাছ ধরতে আসে বলে তাদের ধরে রাখতে হয় কেন?"

"এক দেশের নৌকো তো আর এক দেশে বিনা অনুমতিতে যাবার নিয়ম নেই। তাছাড়া ওরা শুধু মাছ ধরতে আসে, না গুপ্তচরের কাজ করতে আসে, সেটাও জানা দরকার।"

"কিন্তু ওদের বাড়ির দরজা-টরজা তো সব খোলা। ওরা পালিয়ে যেতে পারে না আবার?"

"কী করে যাবে? ওদের নৌকো যে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সমুদ্র দিয়ে আর তো পালাবার কোনো উপায় নেই! ওদের মধ্যে যারা একটু বদমেজাজী, তাদের আটকে রাখা হয় জেলে।"

দাশগুপ্ত এবার কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, "স্যার, আপনি এখানকার জেল দেখতে যাবেন না? এখানকার বিখ্যাত জেল সবাই আগে দেখে। কবে যাবেন? কাল?"

কাকাবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন, "না। কাল সকালে আমার প্রথম কাজ হবে এখানকার দেশলাইয়ের কারখানাটা দেখতে যাওয়া। সেখানকার কারুর সঙ্গে আপনার চেনা আছে?"

দাশগুপ্ত বলল, "হ্যাঁ। অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার মিঃ ভার্গবকে আমি ভালোই চিনি।"

"কাল সকালেই সেখানে যাব।"

পরদিন খুব সকালে উঠেই সন্তু তৈরি হয়ে নিল। তারপর কাকাবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল হেঁটেই। সকালবেলা একটু হাঁটলে ভালোই লাগে। কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়েও হাঁটতে ভালবাসেন। কিন্তু সুস্থির হয়ে হাঁটবার কি উপায় আছে? মাঝে-মাঝেই হঠাৎ-হঠাৎ বৃষ্টি। তখন কোনো গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়। অবশ্য দু-এক মিনিটের বেশী বৃষ্টি থাকে না।

দাশগুপ্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বড় রাস্তায়। সে তাড়াতাড়ি হেঁটে আসছিল। লোকটি বেশ বেঁটে ও মোটা, এত জোরে হাঁটবার জন্য হাঁপাচ্ছিল। সে বলল, "দেশলাইয়ের কারখানা অনেকটা দূর, সেখানে তো হেঁটে যাওয়া যাবে না! দাঁড়ান, এই রাস্তা দিয়ে বাস আসবে!"

মিনিট পনেরো পরেই বাস এল। একদম ভিড় নেই। বাসের মাথায় লেখা আছে চ্যাথাম আয়ল্যান্ড। তার মানে বাসটা অন্য কোনো দ্বীপে যাবে! কী করে সমুদ্রের ওপর দিয়ে বাস যায়?

দেশলাইয়ের কারখানাটা পোর্ট ব্লেয়ার শহরের একেবারে এক প্রান্তে, বন্দরের কাছে। সেখানেই বাস থেকে নেমে পড়া হল, সামনেই কারখানার বড় গেট, আর ডান পাশে সমুদ্র।

কারখানার গেট দিয়ে ঢুকতে গিয়ে কাকাবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর আপনমনে বললেন, "সন্তুকে এখানে

নিয়ে আসা ভুল হয়েছে। ওকে বাংলোতে রেখে এলেই হত!"

সন্তু একটু দুঃখ পেয়েও চুপ করে রইল।

দাশগুপ্ত বলল, "কেন, চলুন না!"

"না, আমরা কারখানায় গিয়ে ম্যানেজার-ট্যানেজারের সঙ্গে কথা বলব, সেখানে ও কী করবে? ছেলেমানুষ, ওর সেখানে থাকা উচিত নয়।"

"তা অবশ্য।"

"সন্তু, তুই আবার এখান থেকে বাস ধরে বাংলোয় ফিরে যেতে পারবি না?"

দাশগুপ্ত বাধা দিয়ে বলল, "না, তার দরকার নেই। ও এখানেই একটু ঘুরে বেড়াক না। আন্দামানে ভয় তো কিছু নেই।"

"ভয়ের কথা বলছি না।"

দাশগুপ্ত সন্তুকে বলল, "তুমি সামনের দিকে একটু এগোলেই একটা ব্রীজ দেখতে পাবে, তার ওপারে চ্যাথাম আয়ল্যান্ড। সেখানটা ঘুরে এসো না!"

কাকাবাবু বললেন, "সেই ভালো, সন্তু, তুই একটু বেড়িয়ে আয় এদিকটা, আবার ঠিক এখানে ফিরে আসবি।"

ওরা কারখানার ভেতরে ঢুকে যাবার পর সন্তু সামনের দিকে এগুলো। একটুখানি যেতেই দেখল বাঁ দিকে সমুদ্রের ওপর একটা কাঠের ব্রীজ। তার ওপারে একটা পুঁচকি দ্বীপ। বড় জোর একটা ফুটবল মাঠের সমান।

ব্রীজটার ওপর পা দিয়ে সন্তুর কেমন যেন অদ্ভুত লাগল। সমুদ্রের ওপর সেতু! রামায়ণে সেই রাম তাঁর বানর-সৈন্যদের নিয়ে সমুদ্রের ওপর সেতুবন্ধন করেছিলেন। সেই কথা মনে পড়ে যায়। হোক না এটা ছোট সেতু, তবু দুটো দ্বীপের মাঝখানে তো, এবং তলায় আসল সমুদ্র।

জলের দিকে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। এখানে জলের রং আর ঘন নীল নয়, কাচের বোতলের মতন হালকা সবুজ। তার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে মাছ, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ। অনেক মাছই রঙিন, লাল, সবুজ, হলুদ, ময়ূরকণ্ঠী—মনে হয় গোটা সমুদ্রটাই যেন একটা অ্যাকোয়ারিয়াম! ব্রীজের কাঠের খুঁটির গায়ে-গায়ে লেগে আছে কাঁকড়া—সেগুলোর একটাও সাধারণ কাঁকড়ার মতন খয়েরি নয়, মাছগুলোর মতনই নানা রঙে রঙিন।

সন্তু কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে মাছেদের খেলা দেখছিল, আবার বৃষ্টি এসে গেল। সে দৌড়ে চলে গেল ব্রীজের ওপারে। চ্যাথাম দ্বীপটাতে বড়-বড় গুদাম ভর্তি কাঠ, এক জায়গায় কাঠ চেরাই হচ্ছে। দ্বীপটার অন্যদিকে রয়েছে কয়েকটা বড়-বড় জাহাজ। কোনোটার নাম এস এস হরিয়ানা, কোনোটার নাম চলুঙ্গা, কোনোটার নাম গঙ্গা। সেখানে কোনো লোকজন নেই। একটু দূরে দেখা যায় সমুদ্রের ওপর কয়েকটা মাছ-ধরা নৌকো।

সন্তু সবচেয়ে বড় জাহাজটার খুব কাছে গিয়ে সেটার গায়ে হাত বুলোতে লাগল। সে কোনোদিন জাহাজে চাপেনি। ফেরার সময় নিশ্চয়ই জাহাজে করে ফেরা হবে! কিন্তু কবে ফেরা হবে?

হঠাৎ সন্তুর মনে হল, সে অনেক দেরি করে ফেলেছে। কাকাবাবুদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, তার জন্যই দাঁড়িয়ে

আছেন। সে তাড়াতাড়ি ব্রীজ পেরিয়ে আবার ফিরে এল ওপরে।

কাকাবাবু আর দাশগুপ্ত ঠিক তখুনি বেরিয়ে এলেন কারখানার গেট দিয়ে। কাকাবাবুর মুখ গম্ভীর থমথমে। ক্রাচের খটখট শব্দ তুলে তিনি এগিয়ে গেলেন সমুদ্রের দিকে। একদম কিনারার কাছে থেমে দূরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটা হাত বোলাতে লাগলেন গোঁফের ওপরে।

সন্তু ফিসফিস করে দাশগুপ্তকে জিজ্ঞেস করল, "সেই সাহেব দুজনকে পাওয়া গেছে?"

দাশগুপ্ত মাথা নাড়িয়ে জানাল, "না।"

"তারা এখানে আসেনি তাহলে?"

"উঁহু! গত দু মাসের মধ্যে এখানকার কেউ বাইরে যায়নি। নতুন কেউ আসেওনি। এখানে মাত্র তিনজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কাজ করে। তাদের দেখলাম, তারা অন্য লোক!"

"তবে সেই সাহেব দুজন নিশ্চয়ই অন্য কোনো হোটেলে আছে।"

"এখানে সাহেবদের থাকার মতন কোনো হোটেল নেই। ওরা যদি বিদেশী হয়, তাহলে তো আরও মুশকিল! কোনো বিদেশীই আগে থেকে অনুমতি না নিয়ে এখানে আসতে পারে না!"

দাশগুপ্ত কাকাবাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "স্যার, আপনি চিন্তা করবেন না, ওদের ঠিক খুঁজে বার করা যাবে। এইটুকু ছোটো জায়গা, এখানে ওরা পালাবে কোথায়?"

কাকাবাবু মুখটা ফিরিয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন, "এখানে অনেক দ্বীপ আছে, তার যে-কোনো একটাতে গিয়ে লুকিয়ে থাকা তো খুব সোজা!"

"কিন্তু এখানে এসে তাদের লুকিয়ে থেকে কী লাভ? কী আর এমন আছে এখানে?"

কাকাবাবু একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর অনেকটা আপনমনেই বললেন, "আছে। কারণ আছে। সেইজন্যই তো আমিও এসেছি এখানে।"

এই সময় চ্যাথাম দ্বীপের পেছন দিক থেকে ভট্‌ভট শব্দে একটা মোটরবোট বেরিয়ে এল। মোটরবোটটা ছোট, ঠিক একটা হাঙরের মতন দেখতে। সেটা সমুদ্রের জল কেটে খুব জোরে ছুটে যেতে লাগল দূরের দিকে। এতদূর থেকেও সন্তুরা স্পষ্ট দেখতে পেল, সেই বোটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে দুজন সাহেব। কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "দাশগুপ্ত, দাশগুপ্ত, একটা মোটরবোট জোগাড় করতে পারো? এক্ষুনি?"

(ক্রমশ)

ম্যাজিক, ম্যাজিক !
জাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র

আমি জাদুকর পি সি সরকার, জুনিয়র, স্পেন থেকে লিখছি। ইতিমধ্যে হল্যান্ড, বেলজিয়াম আর জার্মানিতে ইন্দ্রজাল দেখানো হয়ে গেছে। ভারতবর্ষকে এরা সব ব্যাপারে ছোট করার চেষ্টা করে, কিন্তু ম্যাজিকের ব্যাপারে একদম চুপ হয়ে গেছে। এরা বলতে বাধ্য হয়েছে যে, ভারতের ইন্দ্রজাল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ।

ইউরোপে এসে ম্যাজিক দেখাতে আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে সময় কীভাবে কেটে গেছে খেয়ালই নেই। এতগুলো মাস হয়ে গেল কিন্তু ঠিক যেন মনে হচ্ছে, এই তো সেদিন বাড়ি থেকে এসেছি। তোমাদের জন্য ম্যাজিক লেখার ইচ্ছা আমার বরাবরের, কিন্তু এই বিদেশীদের একটু চমকে দেবার জন্য আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে, সময় করে উঠতে পারিনি। আজকে কাজের ফাঁকে একটু সময় করে উঠতে পেরেছি আর সেইজন্য তাড়াতাড়ি তোমাদের জন্য ম্যাজিক লিখতে বসেছি। আজকে যে খেলাটা শেখাব, সেটা আমি গতমাসে জার্মানির টেলিভিশনে দেখিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আসলে খেলাটা এত সহজ যে, এর কৌশল জানলে তোমরা ভাববে, ইস, ওরা কী বোকা! এটাও বুঝতে পারল না?

আসলে কিন্তু বোকা-চালাকের কোন প্রশ্ন নেই এতে। কৌশলটা না-জানলে যত ছোট ম্যাজিকই হোক না কেন, সবাই অবাক হবেন। তোমরা একটু অভ্যাস করে দেখিও; দেখবে, সব্বাই কেমন ঘাবড়ে যাচ্ছে।

প্রথম থেকে লিখছি। টেবিলের ওপর তিনটে কোকা-কোলার ছিপি আর একটা পয়সা রয়েছে। ছিপি তিনটে একদম সাধারণ। কোন কৌশল নেই তাতে। আর পয়সাটা ধরো একটা সাধারণ নয়া পয়সা। জাদুকর দর্শককে বললেন, ঐ পয়সাটাকে তিনটে ছিপির যে-কোন একটার তলায় লুকিয়ে রাখতে। জাদুকর ছিপিগুলো ছোবেন না, কিন্তু দূর থেকেই তিনি বলে দেবেন কোন ছিপির তলায় পয়সাটা রয়েছে। একথা বলার পর জাদুকর মুখ ঘুরিয়ে রইলেন। একজন দর্শক পয়সাটাকে একটা ছিপির তলায় লুকিয়ে রাখলেন। এবার জাদুকর ছিপি তিনটের কাছে এসে দূর থেকে গন্ধ শুঁকতে লাগলেন। আর তারপর গন্ধ শুঁকেই বলে দিলেন কোন ছিপির তলায় পয়সাটা রয়েছে। সবাই তো অবাক।

এবার তোমাদের কৌশলটা শিখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ ঐ ছিপিগুলোর মধ্যে বোধহয় কোন ফুটো আছে। মোটেই কিন্তু তা নয়। আগেই বলেছি ছিপিগুলো একদম সাধারণ। আসল কৌশলটা রয়েছে পয়সাটার মধ্যে। পয়সাটা একদম সাধারণ পয়সা, তবে তার মধ্যে একটা কারসাজি করা আছে। একটা ছোট চুল, ধর এক ইঞ্চি লম্বা, ঐ পয়সাটাতে আঠা দিয়ে লাগানো ছিল। পয়সাটাকে ছিপি দিয়ে চাপা দিলেও ঐ চুলটা কিন্তু বেরিয়ে থাকবে। এখন গন্ধ শোঁকবার অছিলায় খালি দেখে নিতে হবে কোন ছিপির তলা থেকে একটু চুল বেরিয়ে আছে।

এই খেলাটা বেশীবার করা উচিত নয়, কারণ তাহলে দর্শকের চোখে চুলটা ধরা পড়ে যেতে পারে। তবে নিশ্চিন্ত-ভাবে একবার দেখানো চলে। সব্বার ধারণা হবে ছিপিগুলোর মধ্যে কোন কৌশল আছে। আর সেইজন্য পয়সার সাথে লাগানো ঐ চুলটাতে নজরই দেবেন না। সব অবশ্য নির্ভর করছে তুমি কীভাবে দেখাচ্ছ, তার ওপরে।

তোমাদের নীহার-মাসীর চিঠি

স্নেহের ছোট বন্ধুরা,

মাসিক আনন্দমেলায় পোষা বাঘিনী খৈরীর খবর, ছবি ও তার উপরে ছড়া বেরুবার পর, তোমরা অনেকেই খৈরীর নামে স্নেহমাখা চিঠি লিখতে আরম্ভ করেছ। শুধু একদিনের ডাকেই খৈরীর নামে প্রায় পঞ্চাশটা চিঠি এসেছে। এখনও রোজ চিঠি আসচে। তোমাদের সবাইকে আলাদাভাবে উত্তর দেব। কিন্তু, উত্তর পাবে একটু দেরিতে। কারণ, তোমরা সবাই জানো তো—দেড় বছরের আদুরে মেয়ে খৈরীর দেখা-শোনা করতেই আমাদের অনেকটা সময় লেগে যায়।

তোমাদের অনেকেই বেশ মজার-মজার কথা লিখেছ। চিঠিগুলো পড়ে খুব ভাল লাগল। খুব আনন্দ ও উৎসাহ পেয়েছি। তোমাদের সবাইকে সেই আনন্দের ছোঁয়া কিছুটা দেওয়ার জন্য কিছু-কিছু চিঠির অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

কলকাতার যদু ভট্টাচার্য লেন থেকে সুব্রত সেন (১২ বছর) খৈরীকে লিখেছে—'এই কলকাতায় না তোমার মতো অনেকগুলো বাঘ আছে। কী বিচ্ছিরি সেগুলো। আমাদের দেখলেই খেতে চায়। (তুমি আবার এসব কথা শুনে রাগ করো না কিন্তু।) তুমি ওদের মানুষকে ভালবাসার কথা বলো। অবিশ্যি তাহলে মানুষদেরও তোমাদের ভালবাসতে হবে, কী বলো? তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে। সামনের ছুটিতে আমরা বাড়ির সবাই মিলে যাবই। ইতি মানুষ সুব্রত সেন।'

কোন্নগর (হুগলী) থেকে সুতপা মুখোপাধ্যায় খৈরীকে লিখেছে, 'আনন্দমেলায় তোমার ঠিকানা দেখে অমনি চিঠি লেখার জন্য লাফিয়ে উঠলাম। তোমায় যেমন আমি চিঠি লিখলাম, তুমিও কিন্তু আমায় অবশ্যই চিঠির উত্তর দেবে। তুমি তো লিখতে পারো না, তাই তুমি তোমার মানুষ-মাকে দিয়ে আমার চিঠির উত্তরটা লিখিয়ে নেবে।'

শিবদাস ভাদুড়ী স্ট্রীট, কলকাতা-৪ থেকে মধুপর্ণা ঘোষ, খৈরীকে লিখেছে, "তোমার নামে শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যে ছড়াটি লিখেছেন, সেটা আমার খুব ভাল লেগেছে। আমি যেমন লেখাপড়া, গান ইত্যাদি করি তুমি সেরকম কী কর আমাকে লিখে জানিও। তুমি আমার অনেক আদর ও ভালবাসা নিও।"

যদু কলোনি, কলকাতা-৩৪ থেকে মঞ্জরী দত্তশর্মা লিখেছে, "নীহারমাসী, আমি মঞ্জরী দত্তশর্মা। আমি ক্লাস থ্রি-তে পড়ি। বিদ্যাভারতীতে পড়ি। আমি আনন্দমেলায় তোমার খৈরীর কথা পড়েছি। আমার গরমের ছুটি পড়লে, বাবা আমি, মা, দাদা, দিদিভাই যদি তোমার খৈরীকে দেখতে যাই, অসুবিধে হবে না তো? খৈরী কী খেতে ভালবাসে জানাবে। আমরা নিয়ে যাবো।"

লালবাজার, বাঁকুড়া থেকে অনির্বাণ মজুমদার (৯ বছর) লিখেছে, "স্নেহের খৈরী, তোমার খবর আনন্দমেলায় পড়ে খুব অবাক হলাম। এর আগে বর্ন ফ্রী ও লিভিং ফ্রী বইয়ে তোমার মতো এলসা নামে একজনের (এলসা কিন্তু বাঘিনী নয়, সিংহী) কাহিনী পড়ে খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম। খুব ইচ্ছা থাকলেও এলসাকে চিঠি দেওয়া হয়নি। তাই তোমার খবর জেনে তোমাকে জানার ও তোমার সাথে ভাব করার ইচ্ছা হচ্ছে। ইতি তোমার বন্ধু অনির্বাণ।"

আরও অনেক মজার মজার চিঠি। তোমরা অনেকে খৈরীর খবর শুনে খুশী হয়েছ এবং ওকে অভিনন্দন জানিয়েছ।

তোমাদের স্নেহভরা চিঠিগুলো আমাদের অভিভূত করেছে। অদম্য উৎসাহ ও প্রেরণার উৎস হয়ে রইল তোমাদের এই চিঠিগুলি।

তোমরা ছুটিতে যারা খৈরীকে দেখতে আসবে, আগে থেকে চিঠি লিখে জানালে রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করা হবে। জায়গা কম, হঠাৎ এলে তো জায়গা দেওয়া যাবে না, তাই রিজার্ভেশন চিঠি পাওয়ার পর এলেই ভাল। অবশ্য যেদিন আসবে, সেইদিনই চলে যাবে, এরকম প্রোগ্রাম করলে যে-কোনওদিন আসা চলে। খৈরী এখন আমাদের সঙ্গে সিমুলিপাল পাহাড়ের ভেতর ঘোরাঘুরি করছে। সুতরাং তোমরা যশীপুর ন্যাশনাল পার্কে অফিসে এসে খৈরী সিমলিপালের কোন্ অঞ্চলে সেদিন থাকবে খবর নেবে। তারপর যশীপুর থেকে জীপে ওই অঞ্চলে গিয়ে খৈরীকে দেখতে পাবে। ন্যাশনাল পার্ক অফিসে দুটো জীপ পর্যটকদের জন্য ভাড়া পাওয়া যায়। তোমাদের মতো অন্য কেউ সেদিন জীপ না নিয়ে থাকলে তোমরাও পাবে।

আজ এই পর্যন্ত। খৈরীকে খাইয়ে দেওয়ার সময় হয়েছে। সবাইকে আদর ও ভালবাসা জানিয়ে শেষ করছি। ইতি—

তোমাদেরই নীহারমাসী

আঁকো

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছয়ের পর তিন আর এবার দু আকার দিয়ে আর-এক নকশা তোমাদের ছবির দরজায় হাজির করলাম। তবে একটা বিষয় সব সময় মনে রাখবে—প্রতি মাসে তোমাদের যেমন-যেমন আকারের পুঁজি বাড়ছে তেমন ভাবেই তাদের মিলিয়ে মিশিয়ে অনেক অনেক নতুন নতুন নকশার মেলা তুলে ধরে পুঁজি বাড়াতে হবে। যদি কেউ বলে, দেখাও দেখি কত জানলে, তখন কিন্তু জানি না—পারি না বলে ঘরে দাঁড়িয়ে লজ্জা-লজ্জা ভাব করলে চলবে না। এবারও আমি কিছু নকশা করলুম ঐ আকার দিয়ে। তোমরাও তোমাদের হাত লাগিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে বার করো নতুন নতুন ধরন, আর তাদের জায়গা করে দিতে ভুলো না উৎসব-অনুষ্ঠানে।

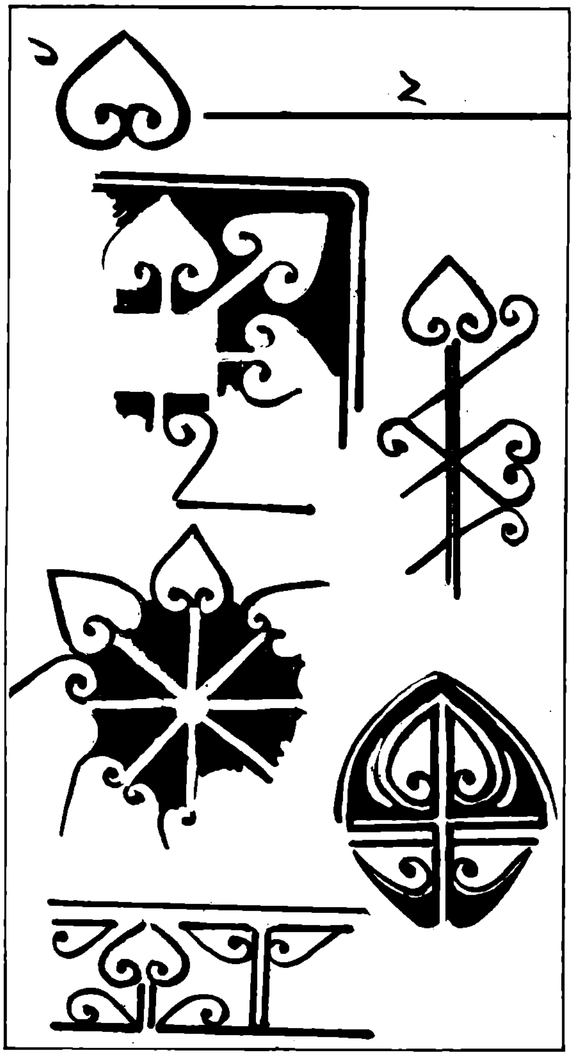

মণিমেলার খবর

কেন্দ্রীয় সমাচার। আগামী তিন বছরের জন্য নতুন কেন্দ্র পরিষদ গঠিত হয়েছে। সকল সদস্যই নিজ নিজ পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ায় সংগঠনে একটি সুস্থ এবং নতুন নজিরের সৃষ্টি হল। এই পরিষদের কার্যকালের মেয়াদ আগামী ৩১ মার্চ, ১৯৭৯ পর্যন্ত। নতুন কেন্দ্র পরিষদ যাঁদের নিয়ে গঠিত হয়েছে তাঁরা হলেনঃ **কেন্দ্রপতি**—শ্রীঅশোককুমার সরকার। **কেন্দ্রমূল**—মৌমাছি। **কেন্দ্র কোষাধ্যক্ষ**—শ্রীমনোজ চক্রবর্তী। **কেন্দ্রমণি**—শ্রীভবতোষ বসু। **সচিববৃন্দঃ সংগঠন**—শ্রীবিষ্ণু সেন। শিক্ষা—শ্রীঅরুণ মৈত্র। ক্রীড়া—শ্রীসুধাংশু দেবদাস। অর্থ—শ্রীসুব্রত সরকার। প্রচার—শ্রীহিরন্ময় সমাদ্দার। শিল্প—শ্রীশঙ্করলাল মল্লিক। আনন্দ—শ্রীঅজয় চক্রবর্তী। দপ্তর—শ্রীচন্দ্রমাধব চট্টোপাধ্যায়। **সদস্যবৃন্দ**—শ্রীজয়চাঁদ পালিত, ডঃ অসীম বর্ধন, শ্রীঅমিয় সেনগুপ্ত, তপন সোম।

মণি-সন্দেশ। কলকাতার রত্নাকর মণিমেলার ৩১তম প্রতিষ্ঠা দিবসে হাসপাতালের শিশুরোগীদের ফল, ফুল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এক বর্ণাঢ্য ক্রীড়া-প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল।

শ্রীরামপুরের শান্তিকামী মণিমেলার ২৮তম প্রতিষ্ঠা দিবসে মণি-ভাইবোনেরা এক আকর্ষণীয় আনন্দানুষ্ঠান পরিবেশন করে।

যাদবপুরের বিবেক মণিমেলার অষ্টাদশ বার্ষিক উৎসবে মণি-ভাইবোনেরা ক্রীড়া প্রদর্শনী, লোকনৃত্য, গীতি আলেখ্য, ইত্যাদি পরিবেশন করে।

হাওড়ার সপ্তর্ষি মণিমেলার পঞ্চম বার্ষিক উৎসব মঞ্চানুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রদর্শনীর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হল।

কসবার বোসপুকুর ধর্মতলা মণিমেলার তৃতীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রদর্শনী ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি মণিমেলার বার্ষিক উৎসবে ভাইবোনেরা এক ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

হাওড়ার স্বামীজী মণিমেলার ভাইবোনেরা এক শিক্ষাভ্রমণে বারাণসী, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে গিয়ে দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিভ্রমণ করে।

বারুইপুরের দক্ষিণ বারাসত মণিমেলায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতি-যোগিতা, গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

কলকাতার যাদবপুর কলোনি মণিমেলার ভাইবোনেরা ঘাটশীলায় এক শিক্ষাভ্রমণে গিয়ে স্থানীয় উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ পরিভ্রমণ করে।

রায়গঞ্জের শ্রাবণী মণিমেলা স্থানীয় কৃষি মেলায় এক আকর্ষণীয় ক্রীড়া প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল।

আসানসোলের সোনার তরী মণিমেলার বার্ষিক উৎসব সম্প্রতি পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

যাদবপুরের রাজাপুর মিলনী মণিমেলার উদ্বোধন উপলক্ষে একটি ক্রীড়া প্রদর্শনী ও লোকনৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কলকাতার বিজয়গড় মণিমেলার ভাইবোনেরা উপেন্দ্রকিশোরের কাহিনী অবলম্বনে সম্প্রতি পরিবেশন করল 'দুষ্টু রাজা মিষ্টি মানিক'।

শ্যামনগরের আতপুর বৈশাখী মণিমেলা গ্রন্থাগারের উন্নতি-কল্পে এক সাহায্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে।

গাব্‌লু

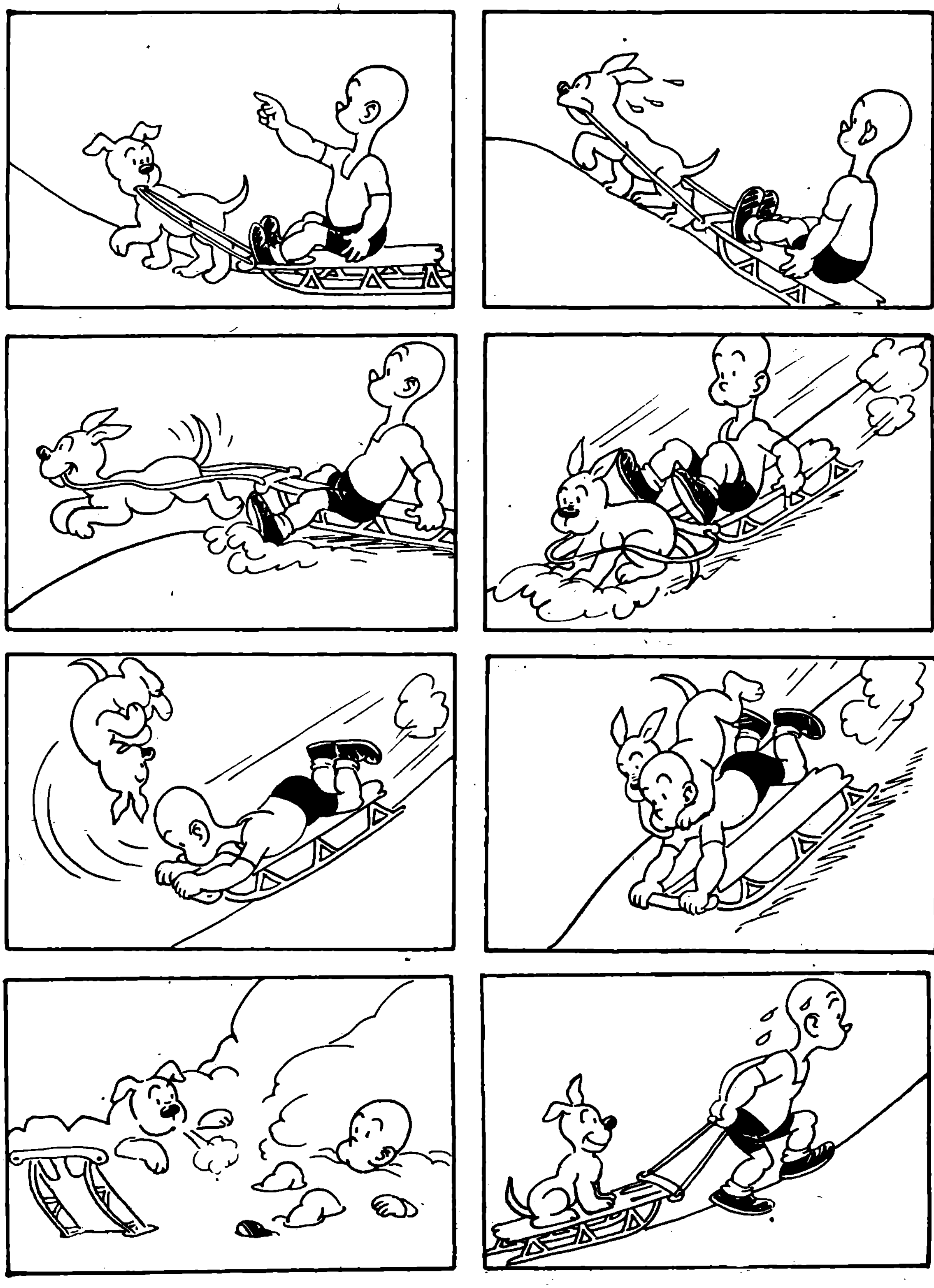

ধাঁধা আর ধাঁধা

ছোট্‌কা এক-এক সময় এমন সব কাণ্ড বাধায় যে কী বলব।

ছুটির সকাল। অফিস ছুটি, ইস্কুল ছুটি। ছুটি-ছুটি মনে তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলি পড়াশোনার পাট। ছোট্‌কার ঘরে হানা দিই।

উদ্দেশ্য খুব সরল। নতুন ধাঁধার ধান্দা। কিন্তু এ কী কাণ্ড রে বাবা।

দরজার মুখেই দেখি দড়ি দিয়ে একটা চায়ের কাপ ঝোলানো। দরজার কড়ায় ফাঁস-তোলা দড়ির গিঁটের অন্য প্রান্তে আটকানো কাপটি মাটির থেকে অল্প উঁচুতে ঝুলছে। বাংলা চারের মতো গিঁটের দুদিকে দুটো ফাঁস।

কাণ্ডটা কী, বোঝার আগেই ছোটকা বলল, "এসো সতুবাবু, এসো। ঐ যে দেখছো দরজার কড়ায় আঁটা দড়িতে একটা কাপ ঝুলছে, ওটা তোমার জন্যই ঝোলানো হয়েছে।"

"আমার জন্য! মানে?" আমি বিস্ময় চেপে রাখতে পারি না।

"হ্যাঁ। তোমার জন্যে।" হাসিহাসি মুখে ছোট্‌কা টেবিল থেকে একটা কাঁচি তুলে আমার হাতে দেয়। তারপর বলে, "কাঁচি দিয়ে দড়িটা কাটতে হবে। এমনভাবে কাটবে দড়িটা, যাতে কাপটা মাটিতে না পড়ে যায়! দড়ি কিংবা কাপ — কোনোটাই হাত দিয়ে ছুঁতে পারবে না। নাও।"

সত্যি-সত্যি কাঁচিটা হাতে নিয়ে আমি বেশ হতভম্ব বোধ করি। দড়ি কাটব অথচ কাপ মাটিতে পড়বে না, কী করে এমনটা সম্ভব আমার মাথায় আসে না। মিনিট পনের এইভাবেই কেটে যায়। কোনো কূল-কিনারা না পেয়ে হাল ছেড়ে বলি, "পারব না ছোট্‌কা। এ অসম্ভব ব্যাপার!"

"অসম্ভব কথাটা থাকে বোকাদের অভিধানে।" ছোট্‌কা কৃত্রিম রাগের গলায় নেপোলিয়ান আওড়ায়। কাঁচিটা আমার হাত থেকে নিয়ে গটগট করে চলে যায় দরজার দিকে।

আমি তাকিয়ে থাকি ফ্যালফ্যাল করে। ছোট্‌কা খুব গম্ভীর মুখে কড়ার মুখে চারের মতো দু পাশে বেরিয়ে থাকা দড়ির ফাঁসের একটি কাঁচি দিয়ে টুক্‌ করে কেটে ফেলে। তারপর হো হো করে হেসে উঠে বলে, "হল তো! দড়ি কাটা হল, কিন্তু কাপ পড়ল না মাটিতে।"

আমি আর কী বলব। মুখ নিচু করে নতুন ধাঁধা টুকতে থাকি।

প্রথম ধাঁধা : এক হাজারের সঙ্গে একটি পূর্ণসংখ্যা যোগ করলে যোগফল যা হয়, সংখ্যাটিকে হাজার দিয়ে গুণ করলে গুণফল তার থেকে কমই হয়। সংখ্যাটি কত?

দ্বিতীয় ধাঁধা : দুই ভাই। একজনের এখনকার বয়স উল্টে দিলে আরেকজনের বয়স পাওয়া যাবে। এঁদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান হল দু-জনের বর্তমান বয়সের সমষ্টির ১/১১ ভাগ। কার কত বয়স?

তৃতীয় ধাঁধা : একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেয়ালঘড়িতে ঢং করে একটা ঘণ্টা বাজল। উঠে, আলো জেলে যে সময় দেখব, ইচ্ছে করছিল না। চুপচাপ শুয়ে নানা কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হল, শুধু ঘণ্টা শুনেও তো সঠিক সময় জানা অসম্ভব কিছু নয়। আমাদের ঘড়িতে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর ঢং করে একটা ঘণ্টা বাজে; আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঢং ঢং করে সময় বাজে। সমস্যার সমাধান করার আগেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

তোমরা বলতে পার, ঘড়িতে একটা 'ঢং' শব্দ শুনে সঠিক সময় জানার জন্যে বেশী পক্ষে কতক্ষণ সময় আমাকে জেগে থাকতে হতে পারত?

চতুর্থ ধাঁধা : একজন মজুরের সঙ্গে চুক্তি ছিল, ১০ হাত ঘন একটি গর্ত করার জন্য তাকে ১০ টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু সে ৫ হাত ঘন গর্ত করে কাজ ছেড়ে দেয়। হিসেব মতো তার কত টাকা প্রাপ্য?

গতবারের ধাঁধার উত্তর (১) মুক্তোটি পাওয়া যেহেতু সম্পূর্ণ ভাগ্যের ব্যাপার তখন সেটা গ-বাবুরই প্রাপ্য। অধিকাংশ আইন-জানা লোকের তাই মত। (২) ২৯ ও ৭ সংখ্যা দুটি ছাড়া ২০৩ টাকার হিসেব মেলে না। জিনিসপত্রের দাম যেহেতু ১০ টাকার বেশী, সুতরাং ৭ জন বন্ধু প্রত্যেকে ২৯ টাকার জিনিস কিনেছে ধরতে হবে। (২৯×৭= ২০৩) (৩) Queue (৪) সবরকম সম্ভাবনাই বিবেচনা করতে হবে। ৮টি গুলি তুললে চাপানো শর্ত মিললেও হয়তো মিলতে পারে। কিন্তু 'হয়তো' থেকে যাচ্ছে। ৮টা গুলি তোলার পর এমনও তো হতে পারে যে, নীল রঙের আটটা গুলি থেকে গেল এবং অন্য দুটি রঙের দুটি করে গুলি পড়ে রইল। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় শর্ত মিলছে না।

সুতরাং ৭টি গুলি তুলতে হবে।

সত্যসন্ধ

আচ্ছা বলো তো

প্রঃ কোন মাসে সব গল্পই মিথ্যে হয়ে যায়?
উঃ আষাঢ়ে।

প্রঃ কোন গিরিপথ হাঁটা-চলার জন্যে নয়?
উঃ খাইবার।

প্রঃ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে তৃতীয় টেস্টে গাভাসকর একশো দুই রানে আউট হবার ফলে কী হল?
উঃ তার আর একশো তিন রান করা হল না।

প্রঃ কোন জায়গায় জিনিস মাটি?
উঃ মালভূমি।

প্রঃ দেশে দশ বছর বাদে কী হবে বলতে পার?
উঃ উনিশ শো ছিয়াশি সাল।

প্রঃ সাবান দিয়ে কাপড় কাচলে কী হয়?
উঃ সাবানটা একটু ছোট হয়ে যায়।

প্রঃ কোন্‌ নদীকে প্রায় প্রত্যেক রান্নাতেই দরকার হয়?
উঃ হলদি।

প্রঃ সেই যে এক রাজা ছিলেন, সেই রাজা একদিন কী বললেন?
উঃ আর তো খাজা খেতে পারি না বাবা।

প্রঃ পাঁচশো কী করে পঁচিশ হয়?
উঃ আকারের উপর হ্রস্ব ই-এর আঁকড়ি দিলে। অবশ্য পরের ওকারটাও উড়িয়ে দিতে হবে।

প্রঃ খিচুড়ির সঙ্গে ডিমভাজা কেন আইসক্রীম আইসক্রীম লাগে?
উঃ জমে ভাল।

প্রঃ পৃথিবী কী দিয়ে তৈরি?
উঃ তিনটে অক্ষর।

প্রঃ মস্কো থেকে ভ্লাডিভস্টকের দূরত্ব ধরা যাক ৯০০০ কিলোমিটার। এদের স্থানীয় সময়ের তফাত ৯ ঘণ্টা। তুমি সকাল আটটার সময় ভ্লাডিভস্টক থেকে বেরিয়ে সেই দিনই সকাল আটটায় মস্কো পৌঁছলে। তাহলে তোমার প্লেনের গতিবেগ কত?
উঃ কোনোদিন ভ্লা ডি ভ স্ট ক ঢুকলামই না, তার বেরোনো!

ভানুমতী

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি

উপন্যাস

ফটোটা কী করে যে মনোজদের বাসায় এল, তা কেউ জানে না। ফটোটা কার, তাও কেউ বলতে পারে না। মনোজদের বাড়িতে অনেকের ফটোর মধ্যে এই ফটোটাও বরাবর আছে। অথচ কেউ ঠিক করে বলতে পারে না যে, এটা কোত্থেকে কবে এসেছিল, ফটোর ছেলেটাই বা কে!

ফটোটা একটা ছেলের। তার বয়স হবে আট নয় বা দশ। একটা বাংলো-বাড়ির সামনের বারান্দার সিঁড়িতে সে বসে আছে। সামনের বাগান থেকে বারান্দায় উঠতে মোট তিন ধাপ সিঁড়ি। ঠিক মাঝের ধাপে ছেলেটা বসে আছে, নীচের সিঁড়িতে পা, ওপরের সিঁড়িতে কনুই রেখে সে একটু পিছনে হেলে বসে আছে। তার পায়ে বুটজুতো আর মোজা, সাদা হাফপ্যান্ট, গায়ে ফুলহাতা সোয়েটার, আর সোয়েটারের গলার কাছে সাদা শার্টের কলার বেরিয়ে আছে। ছেলেটা দেখতে ভীষণ সুন্দর। বড় বড় চোখ, লম্বাটে মুখ, চোখা পাতলা নাক, গালগুলো ভরাট কিন্তু লুচির মতো ফোলা ফোলা নয়। তার চুলে ডানদিকে সিঁথি, আর কপালটার অনেকখানি ঢেকে চুলগুলো পাট করা। ছেলেটা অল্প একটু হাসিমুখে চেয়ে আছে। সেই হাসি আর তাকানো এত জীবন্ত যে, যে-কোনো সময়ে ছেলেটা যেন কথা বলে উঠবে। ছবিটার মধ্যে আরো দুটো অদ্ভুত ব্যাপার আছে। ছেলেটার পিছনে যে বারান্দা তাতে টেরছা হয়ে রোদ পড়েছে। বারান্দার পিছনে দরজা, দরজায় একটা গোলাপ ফুলের ছাপওলা পর্দা ঝুলছে। সামনে রোদ, কিন্তু পর্দাটা ছায়ায়, তাই পর্দার গায়ে গোলাপের ছাপ একটু অস্পষ্ট। আর সেই পর্দাটা একটুখানি সরিয়ে একটা মুখ উঁকি মেরে আছে। মুখটা খুবই অস্পষ্ট। শুধু সেই মুখে একটু হাসি বোঝা যায়। যেন কেউ হাসিমুখে ছেলেটার ছবি-তোলানো দেখছে। কিন্তু সেই মুখটা ছেলের না মেয়ের, তা বোঝা যায় না। আরো একটা মজার ব্যাপার হল, ছেলেটার বাঁ দিকে একটা কাচের গেলাসে তিন পোয়া ভর্তি দুধ রয়েছে। দুধ কিনা তা ঠিক করে বলা যায় না, তবে সাদামতো তরলটা দুধ ছাড়া আর কীই বা হবে। আর সেই প্রায় পৌনে এক গেলাস দুধে মুখ ডুবিয়ে দুধটা খেয়ে নিচ্ছে একটা বেশ বড়সড় মোটা বেড়াল। বেড়ালটার লেজও খুব মোটা। বোঝা যায়, ছেলেটা দুধ খাচ্ছিল, সেই সময়ে ফটো তোলাতে গিয়ে গেলাসটা পাশে রেখেছিল, আর তখন ছেলেটাকে অন্যমনস্ক দেখে বেড়ালটা চুপিচুপি এসে চুরি করে দুধ খেয়ে নিচ্ছে। ছেলেটা টের পায়নি। ছবিটার মধ্যে আরো কিছু কিছু জিনিস লক্ষ করা যায়। যেমন, বারান্দার নীচে বাগানের একটু অংশ ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বাগানে অনেক গাঁদা, ক্রিসেন্থিমাম, পপি ফুল ফুটেছে। বাংলো-বাড়িটার টিনের চাল। বারান্দার ওপরে টিনের চালটার একটু ঢালু অংশ দেখা যায়। বারান্দার থাম বেয়ে একটা লতানে গাছ উঠেছে চালে।

মনোজ যে কতবার ছবিটা দেখেছে তার হিসেব নেই। ছবিটা দেখতে তার বড় ভাল লাগে। কেন ভাল লাগে তাও সে জানে না। যদি কখনো তার মন খারাপ হয়, বা কখনো কারো সঙ্গে ঝগড়া হয়, বা মায়ের ওপর অভিমান হয়, তখন সে এসে একা ঘরে ছবিটা বের করে চেয়ে বসে থাকে। ছবি থেকে ছেলেটাও তার দিকে হাসিমুখে চেয়ে থাকে। তখন মনোজের মনের মধ্যে কী যেন হয়, সে ভাবে— এই তো আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু। তখন তার মন ভাল হয়ে যায়। মনোজ খুব ছেলেবেলা থেকেই তাদের বাড়িতে ছবিটা দেখে এসেছে। আর ছবিটা বেশ পুরনো, একটু হলদে-হলদে পুরনো ছাপও পড়ে গেছে তাতে। অর্থাৎ ছবিটা অনেক আগে তোলা হয়েছিল, এবং ছবির ছেলেটা নিশ্চয়ই এখন আর ছোট নেই। সে হয়তো অনেক বড় হয়ে এখন মনোজের কাকা বা বাবার মতো বড় মানুষ হয়ে গেছে। তবু ছবির ছেলেটাকে মনোজ বন্ধু বলেই ভাবে। ভাবতে ভাল লাগে। এই ছবিটার কোনো ঠিকানা নেই, কোথায় কবে তোলা হয়েছিল কেউ জানে না। তাই বাড়ির লোকেরা এই ছবিটা দেখলেই বেশ বিব্রত হত। বলত, এ ছবিটা

যে কার কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের কেউ নয় নিশ্চয়ই। মনোজ তাই একটু বড় হয়ে ছবিটা অন্যান্য ছবি থেকে আলাদা করে নিয়ে এসে তার গল্পের বইয়ের তাক-এ একটা ছোটদের রামায়ণ-বইয়ের পাতার ভাঁজে যত্ন করে রেখে দিয়েছে। নিজের কাছেই রাখা ভাল, নইলে কে কবে বাজে ছবি ভেবে ফেলে-টেলে দেবে।

মনোজদের বাড়িতে অনেক লোক। ঠাকুমা, বাবার এক বুড়ি পিসী, মা, বাবা, দুই কাকা, দিদি, দাদা, দুটো ডলপুতুলের মতো ছোট ভাইবোন। এ ছাড়া বাড়িতে থাকে একটা নিরাশ্রয় বুড়ো লোক, তার বাড়ি বিহারে। একটা বাচ্চা চাকর, একটা রান্নার ঠাকুর, এক বুড়ি ঝি। তা ছাড়া বিস্তর বাইরের লোকজনের রোজ আসা-যাওয়া তো আছেই। যেমন পুরুতমশাই সতীশ ভরদ্বাজ, মাস্টারমশাই দুঃখহরণবাবু, দিদির গানের মাস্টারমশাই গণেশ ঘোষাল, এমনি আরো কত কে!

উবু হয়ে না-বসলে দুঃখহরণবাবু পড়াতে পারেন না। যদি কেউ তাঁকে আসন-পিঁড়ি করে বসিয়ে দেয়, বা চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসতে বলে, তাহলেই দুঃখহরণ-বাবুর বড় বিপদ। তখন তিনি অঙ্ক ভুল করেন, ইতিহাসের সংগে ভূগোল গুলিয়ে ফেলেন, ইংরিজী ট্রান্স্লেশন করতে হিমসিম খান। যেই উবু হয়ে বসলেন, অমনি তাঁর আঙুল দিয়ে পেনসিল বেয়ে হড়হড় করে অঙ্ক, ট্রানস্লেশন, জ্যামিতি সব নেমে আসতে থাকে, মুখে খই ফোটে ইতিহাস আর ভূগোলের।

সকালবেলাতেই দুঃখহরণবাবুর বিপদ। সেই সময়টায় মনোজের বাবা রাখোহরিবাবু পড়ার ঘরে এসে বসে গম্ভীরভাবে খবরের কাগজ পড়েন। রাখোবাবু ভীষণ রাশভারী লোক, বাড়ির কুকুরটা বেড়ালটা পর্যন্ত তাঁকে ভয় খায়, বাড়ির লোকজনের তো কথাই নেই। কিন্তু সকালবেলাতে রাখোবাবু যে মনোজদের পড়ার ঘরে এসে বসেন তার একটা কারণ আছে। এ-বাড়িতে একজন মানুষ আছেন, যিনি রাখোবাবুকে মোটেই ভয় খান না, বরং উল্টে রাখোবাবুই তাঁর ভয়ে অস্থির। তিনি রাখোবাবুর পিসিমা আদ্যাশক্তি দেব্যা। বাবার পিসীকে ঠাকুমা ঠাকুরঝি বলে ডাকেন, সেই থেকে মনোজরা সবাই তাঁকে 'ঠাকুরঝি' ডাকে। তিনি খুব অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন, সেই থেকে উপোস-টুপোস করে করে বুড়ো বয়সে ভীষণ তেজস্বিনী হয়ে গেছেন। কারো তোয়াক্কা করেন না। তাঁর আবার ভয়ংকর শুচিবাই। সকালে কাঁচা গোবর জলে গুলে সেই জল সারা বাড়িতে ছিটিয়ে দেন। মনোজদের পড়ার ঘরটা বাড়ির বাইরে, বাগানের ধারে। একটেরে ছোট্ট একটু ঘর, তাতে এক ধারে পড়ার টেবিল চেয়ার, অন্য ধারে তক্তাপোষের ওপর দুঃখহরণ-বাবুর বিছানাপত্র। এই ঘর অবধি ঠাকুরঝি আসতে পারেন না, খোঁড়া পায়ে বাগান পেরোতে কষ্ট হয়। তাই এ-ঘরটা গোবরজলের হাত থেকে বেঁচে যায়। রাখোবাবু তাই গোবরের গন্ধ এড়িয়ে নিশ্চিন্তে শ্বাস নেওয়ার জন্য এই ঘরে এসে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে যান, ততক্ষণে ঘর-দোরের জল শুকিয়ে যায়।

রাখোবাবু কড়া ধাতের লোক, আদবকায়দার নড়চড় দেখলে খুব রাগ করেন। তাই সে-সময়টায় দুঃখহরণ-বাবুকে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে হয়। আর ঐ এক ঘণ্টায় দুঃখহরণবাবু রাজ্যের ভুলভাল করতে থাকেন। একদিন তিনি ঐ অবস্থায় ট্রানস্লেশন করতে গিয়ে 'তখন হলঘর ভরিয়া গিয়াছে' এই বাক্যটার ইংরেজী করলেন 'বাই দেন দি হল রুম ওয়াজ ফুলফিলড।' এই ইংরেজী শুনে বাবা তাঁর ইংরেজী খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বিরক্ত হয়ে তাকালেন। ছেলেমেয়ের সামনে মাস্টারমশাইয়ের ভুল ধরলে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা কমে যেতে পারে, সেই জন্য বললেন—"দুঃখবাবু, ইংরিজীটা ঠিকই আছে, তবে একটু কানে কেমন যেন লাগছে। আর একবার অন্যভাবে করুন।" কিন্তু দুঃখহরণবাবু পা ঝুলিয়ে বসে আছেন যে, তার ওপর রাশভারী রাখোবাবুর কথা শুনে আরো ঘাবড়ে গিয়ে খুব শক্ত ইংরেজীতে বললেন—"দি হল'স্ ফুলফিলমেণ্ট ওয়াজ অ্যাচিভড বাই দেন।" শুনে রাখোবাবু আর মুখ তুললেন না। দুঃখহরণবাবুও গোলমালটা বুঝতে পারছেন, কিন্তু উবু হয়ে না-বসলে তাঁর মুড আসে না। তাই তিনি ঠ্যাং দুটো জোর নাচাতে নাচাতে মুখে 'হুঁ হুঁ' করে একটা শব্দ করে যেতে লাগলেন। দাদা সরোজ, দিদি পুতুল, আর মনোজ চুপিসারে হাসাহাসি করছে।

শীতকাল। বাগানে খুব ফুল ফুটেছে। সামনের দিকটায় মস্ত মস্ত গাঁদা ফুটে আছে, সেগুলো এত বড় যে দু হাতে মুঠো করেও বেড় পাওয়া যায় না। মোরগ ফুল, পপি, গোলাপ তো আছেই। ফটফটে রোদে প্রজা-পতি আর ফড়িং উড়ছে অনেক, পোকামাকড় টিঁ টিঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাগানের অন্য ধারে পালং ক্ষেত, ফুল-কপি, ওলকপি, ধনে পাতা, বেগুন লাগানো হয়েছে। সেই সবজি ক্ষেতে দেহাতি বুড়ো মানুষ রামখিলাওন খুরপি হাতে ঘুরঘুর করছে। যদিও একটা ঠিকে মালী এসে বাগানের কাজ করে যায় রোজ, তবু রামখিলাওন কাজ দেখানোর জন্য বাগানে সব সময়ে কিছু খোঁড়াখুঁড়ি করবেই। চোখে ভাল দেখতে পায় না, অনেক সময়ে গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়ে আলগা করতে গিয়ে শেকড়-বাকড় উপড়ে ফেলে। আগাছা তুলতে গিয়ে ফুলগাছ তুলে ফেলে দিয়ে আসে। বকুনি খেলে খুব গম্ভীরভাবে থাকে, যেন এসব বকাবকি তার তেমন গায়ে লাগে না। গতবার ঠাকুমার চশমা পালটানো হল, আর রামখিলাওন ঠাকুমার পুরনো চশমাটা চেয়ে নিল। সেই চশমাটা এখন সব সময়ে চোখে পরে থাকে। তাতে যে সে ভাল দেখতে পায় তা নয়। কিন্তু এমন ভাব দেখায় যে খুব ভাল দেখছে। চশমা পরে ইজ্জতও বেড়ে গেছে তার। বাজারের কাছে দেশওয়ালী ভাইদের কাছে চশমা পরে যাওয়ায় সেখানে তার খাতিরও নাকি বেড়ে গেছে। বাড়ির চাকর রঘু তাকে 'রামু' বলে ডাকলে বা তুই-তোকারি করলে সে ভারি চটে যায়। রঘু তাই তাকে আজকাল 'রামুবাবু' বলে ডেকে আপনি-আজ্ঞে করে। কিন্তু সন্ধে হলেই রঘু নানা কায়দা করে রোজ রামুকে ভূতের ভয় দেখাবেই।

আজ দুঃখহরণবাবুর ভুলভাল কিছু বেশী হচ্ছে। দাদা সরোজকে ইতিহাস বোঝাতে গিয়ে তিনি বারবার ওয়ার্ড মিনিং বোঝাতে লাগলেন, ইতিহাস বইতে দুটো ব্যাখ্যাও দাগিয়ে দিলেন। পুতুলকে সুদ-কষা বোঝাতে গিয়ে তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, "মুখস্থ যেন ভুল না হয়, আর দাঁড়ি কমা সেমিকোলন সম্পর্কে সাবধান থাকবে।" মনোজের ভূগোল-বই খুলেও তিনি গোলযোগ করে ফেললেন, পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন জেলায় ধান ও পাট জন্মায় তা বলতে গিয়ে তিনি বারবার 'নর' শব্দের রূপ এনে ফেলছিলেন। তাই শুনে রাখোবাবু বিরক্ত

হয়ে উঠে পড়লেন। ঘরে গোবরের গন্ধ, পড়ার ঘরে ভুল-ভাল পড়ানো, কোথায় আর যাবেন! তাই বাগানে পায়চারি করতে-করতে দেখেন, রামু একমুঠো দুব্বো ঘাস, কয়েকটা কড়াইশুঁটি আর একটা গাজর বাগান থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

রাখোবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওসব কোথায় নিচ্ছিস রে রামু? দেখি, কী তুলেছিস?"

রামু একগাল হেসে হাতের জিনিসগুলো দেখিয়ে বলল, "বুড়ি মা পাঠালেন কিছু ধনেপাতা, কাঁচা লঙ্কা আর একটা মুলো তুলে আনতে।"

রাখোবাবু রেগে অস্থির। বললেন, "স্টুপিড, কবে থেকে বলছি হাসপাতাল থেকে চোখের ছানি কাটিয়ে আয়। কিছুতেই শুনবি না? কোন্ আক্কেলে তুই লঙ্কা বলে কড়াইশুটি, মুলো মনে করে গাজর আর ধনে-পাতার বদলে গুচ্ছের ঘাস তুললি। আজই চল্ তোকে হাসপাতালে নিয়ে যাবো, চোখ কাটিয়ে আসবি।"

শুনে রামু ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল। রাখোবাবু রাগারাগি করতে-করতে ভিতর বাড়িতে চলে গেলেন। পড়ার ঘরে দুঃখবাবু চেয়ারের ওপর টপ্ করে উবু হয়ে বসতেই তাঁর চেহারা পাল্টে গেল। মুহূর্তের মধ্যে তিনি ধান ও পাটের জেলা ঝরঝরে মুখস্থ বলতে লাগলেন, সুদকষা জল করে দিলেন, ইতিহাসের সন-তারিখ শুধু আকবরের খুড়তুতো ভাইয়ের নাম পর্যন্ত তাঁর মনে পড়ে গেল।

ঠাকুমা বামাসুন্দরী ডালের বড়ি দিচ্ছিলেন রোদে বসে। একটা কাক তাঁকে অনেকক্ষণ ধরে জ্বালাতন করছে। কাকটার সাহসেরও বলিহারি! এ বাড়িতে ঠাকুর-ঝি জেগে থাকতে বেড়াল কুকুর কাকপক্ষী ঢুকতে বড় একটা সাহস পায় না। কে কোথাকার এঁটোকাঁটা আঁস্তাকুড় টেনে আনে ঘরে, সেই ভয়ে ঠাকুরঝি লাঠিটি হাতে সারা বাড়ি খোঁড়া পায়ে ডিং মেরে-মেরে ঘুরে বেড়ান। কত কুকুর, বেড়াল, কাকপক্ষী যে তাঁর হাতে রামঠ্যাংগা খেয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। ইদানীং তিনি শুধু লাঠির ওপর ভরসা না-রেখে পেয়ারা গাছের ডাল কাটিয়ে একটা গুলতি বানিয়ে নিয়েছেন। গুলতির যে চামড়ার অংশটুকুতে গুড়ুল ভরতে হয়, সে-জায়গাটায় চামড়ার বদলে কয়েক পাল্লা ন্যাকড়ার পট্টি লাগিয়ে নিয়েছেন, চামড়া ছুঁতে পারেন না। গুলতি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঠাকুরঝির হাতের টিপও হয়েছে চমৎকার। সট সট করে গুড়ুল ছোঁড়েন, ঠিক গিয়ে বেড়ালের লেজের লোম খসিয়ে দেয়, কাকপক্ষীর ডানার পালক ঝরে যায়, কুকুরের ঠ্যাং খোঁড়া হয়। এ বাড়িতে আদ্যশক্তি আছেন জেনেও কাকটা ঘুরঘুর করছে। তেল-মাখানো কাঁসার থালা, টিনের টুকরো রোদে পেতে দিয়েছেন বামাসুন্দরী, ডাল ফেটাচ্ছেন। ডাল ফেটানোতে

তাঁর জুড়ি নেই। বারো মাস ডাল ফেটিয়ে তাঁর ডান হাতে বেশ জোর হয়েছে। পাঞ্জা কষলে মেজোকাকা ব্যায়ামবীর হারাধনও ঠাকুমাকে হারাতে বেগ পাবেন। তা ঠাকুমা ডাল ফেটাচ্ছেন। কাকটা ঘুরঘুর করছে। ডালে কালোজিরে মেশাবেন বলে কালোজিরের পুরিয়াটা পাশেই রেখেছেন। কাকটা এক ছোঁ দিয়ে নিয়ে গেল।

ঠাকুমা চেঁচালেন, "ও ঠাকুরঝি!"

কিন্তু ঠাকুরঝি তখন কোথায়! কেউ সাড়া দিল না।

ঠাকুমা বকবক করতে করতে উঠলেন। কাকটা পেঁপে গাছে উঠে বসে ছিল। কী খেয়ালে হুউশ করে উড়ে এসে ঠাকুমার খোঁপায় একটা ছোঁ মারল। তাতে ঘোমটা খসে গেল। ঠাকুমা ফের চেঁচালেন, "ও ঠাকুরঝি!' কাকটার ভাবসাব মোটেই ভাল দেখছি না। গুলতিটা নিয়ে এসো।"

পুরুতমশাই সতীশ ভরদ্বাজ ঘোষালবাড়ির নারায়ণ পুজো সেরে ফিরছেন। এ-সময়টায় মনোজদের বাড়িতে বসে তিনি খানিক খবরের কাগজ পড়ে যান, যাওয়ার সময়ে গৃহদেবতার ভোগটাও নিবেদন করে যান। এক কাপ চা, দুটো বিস্কুট আর পাঁচটা পয়সা তাঁর রোজকার বরাদ্দ। তিনি উঠোনে ঢুকে দেখেন, বামাসুন্দরী ডালের বাটি ফেলে বারান্দায় উঠে গিয়ে চেঁচামেচি করছেন, কাকটা ফেটানো ডালে নেচে বেড়াচ্ছে, সব ছয়ছত্রখান। বামাসুন্দরী তাঁকে দেখে প্রায় কেঁদে ফেললেন, "দেখেছেন ঠাকুরমশাই, দজ্জাল কাকের কাণ্ডটা?"

সতীশ ভরদ্বাজ বড় খাইয়ে মানুষ। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, বড় ভুঁড়ি, বয়স সত্তরের কাছাকাছি। এ-বয়সেও জোয়ানমদ্দরা মাছ বা রসগোল্লার কম্পিটিশনে তাঁর ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে না। পাতে পড়তে-না-পড়তে তুলে ফেলেন। লোকে বলে তাঁর নাকি দুটো পোষা ভূত আছে, খাওয়ার সময়ে আবডাল থেকে তারাই সব তুলে খেয়ে ফেলে। নইলে ঠাকুরমশাই কি আর ঐ অত চারটে মানুষের সমান খাবার খেতে পারেন? তবে সতীশ ভরদ্বাজ যে ভূত পোষেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রায় সময়েই দেখা যায়, খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ তিনি 'উ' বলে যেন কার নিঃশব্দ ডাকে সাড়া দেন, ঘাড় ঘুরিয়ে হঠাৎ যেন কার সঙ্গে ফিসফিস করে খানিক কথা বলে নেন, আবার কখনো হঠাৎ রাস্তায়ঘাটে চেঁচিয়ে 'হাঁদু' 'ভুঁদু' বলে কাদের ডাকাডাকি করেন। এইসব কারণে সবাই তাঁকে খানিকটা ভয় খায়।

কাকের কাণ্ড দেখে সতীশ ভরদ্বাজ দাঁড়িয়ে গেছেন। কিছুক্ষণ দেখেটেখে একটা শ্বাস ফেলে খড়মের শব্দ তুলে বারান্দায় উঠে এলেন। তাঁর জন্য রোদে গদি-ওলা মোড়া পেতে রাখা আছে, তাইতে বসে বললেন, কাক! এ-বাড়িতে মা আদ্যাশক্তি থাকতে কাক আসবে কোত্থেকে! তেমন সাহসী কাকই বা কৈ?"

ঠাকুমা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেন, "ঐ দেখুন লক্ষ্মীছাড়া এক বাটি মাসকলাই-বাটা নষ্ট করল। কত কষ্ট করে ফেটিয়েছি।"

"ও কাক নয় মা।" সতীশ ভরদ্বাজ গম্ভীর হয়ে বলেন।

"তবে কী?"

সতীশ ভরদ্বাজ আবার একটা শ্বাস ছাড়েন।

রঘু এসে খবরের কাগজ দিয়ে গেল। সতীশ ভরদ্বাজ কাগজ খুলে আইন-আদালতের খবর পড়তে-পড়তে বললেন, "চল্লিশ বছর আগে জয়দেবপুরে একবার এই রকম কাকের পাল্লায় পড়েছিল মোক্ষদা ঠাকুমা। দেখতে অবিকল দাঁড়কাক, কিন্তু তার হাবভাবে আর দুষ্টুবুদ্ধিতে ঠাকুমা অস্থির। রোজ এসে সব লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করে যায়। তীর-ধনুক, ঢিল-পাটকেল, কাক-তাড়ুয়া কোনো কিছুকে গ্রাহ্য করে না। সবশেষে জ্বালাতন হয়ে ডেকে পাঠাল আমাকে। গিয়েই বুঝলাম কাকের রূপ ধরে এ কোনও আত্মা-টাত্মা এসেছে। বললাম, এ কাক তো তাড়ালে যাবে না ঠাকুমা, নারায়ণ-পুজো দাও, আর শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাও। সেই করতেই কাকটা যে পালাল, আর এল না। এ কাকটাকেও দেখুন না, যেন ঠিক কাক। কিন্তু কাকের মতো ব্যবহার কি? একটু লক্ষ করলেই দেখবেন, এ-পাখিটা কাকের চেয়েও কালো, ওর লাফানোটাও কাকের মতো নয়। এসব কিসের লক্ষণ সে আমি জানি। বাড়িতে একটা অমঙ্গল না হয়!"

ঠাকুমা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখে কথা নেই।

আর এ-সময়ে গোয়ালঘরের দিক থেকে সোরগোল উঠল, রঘু আর বুড়ি ঝি কিরমিরিয়া চিৎকার করে বলছে, "ঠাকুরঝি পড়ে গেছে, ঠাকুরঝি পড়ে গেছে।"

তা এরকম সোরগোল প্রায়ই ওঠে। ঠাকুরঝি সাত দিনে সাতবার আছাড় খান। লোকে বলে, ঐটাই তাঁর নেশা। তাঁর হবি। যেখানে কেউ কোনোদিন পড়ে যায় না এমন শুকনো সমতল জায়গাতেও ঠাকুরঝি তাঁর বরাদ্দ আছাড়টা খেয়ে নেন। শোনা যায়, দেশের বাড়িতে সেই ঢাকা জেলার গ্রামে থাকতেও তিনি প্রায়ই ঘরের পাটাতনে মই বেয়ে পুরনো তেঁতুল কি আমচুড় পাড়তে উঠে আছাড় খেতেন, পুকুরঘাটে পড়তেন, উঠোনে হড়কাতেন, এমন কী খোঁটায় বাঁধা গরু পর্যন্ত তাঁকে দেখলে দৌড়ে এসে দড়ির প্যাঁচ মেরে ফেলে দিত। অত সব আছাড় খেয়ে খেয়েই তাঁর পা একটু খোঁড়া, হাতও একটু বাঁকা, গ্রামদেশে তো হাড় জোড়া দেওয়ার ডাক্তার ছিল না, গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার পট্টি বেঁধে ছেড়ে দিত। ভাঙা হাড় বাঁকা হয়ে জোড়া লেগে যেত।

ঠাকুরঝি আছাড় খেয়েছেন শুনে পড়া ভণ্ডুল হয়ে গেল। মনোজ, সরোজ, পুতুল তিন ভাই-বোন যথাক্রমে ভূগোল, অঙ্ক, ইতিহাস ফেলে দৌড়ে উঠে এল। দুঃখবাবু উবু হয়ে বসে মন দিয়ে অঙ্ক কষছিলেন। অনেকক্ষণ বাদে টের পেলেন যে, সামনে ছাত্রছাত্রীরা কেউ নেই।

ভারী বিরক্ত হয়ে তিনি তখন গানের মাস্টারমশাই গণেশ ঘোষালের ঘরে গেলেন দুটো গল্প করতে। গিয়ে দেখেন, সেখানেও এক গোলমাল।

গণেশবাবু আত্মহত্যা করবেন বলে চালের বাঁমের সঙ্গে একটা মোটা দড়ির ফাঁস ঝুলিয়ে দড়িটা টেনে-টুনে দেখছেন।

দুঃখবাবু বললেন, "এ কী?"

(ক্রমশ)

ভুতুড়ে ট্যাক্সি

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইফোঁটা শেষ হবে পাঁচটার মধ্যে। পপনের চার দিদি, আর তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে তার আগেই গিয়ে পেঁছতে হবে। দিদি বেশ গিন্নী-বান্নি লোক, পপনকে ভীষণ ভালবাসেন। থাকেন বেলঘরিয়ায়। পপনের বাবা পপনকে চিরকাল শিখিয়েছেন, সব কাজ প্রোটোকল মেনে করবে। এই প্রোটোকল ব্যাপারটা কী, পপন অনেকদিন পর্যন্ত বুঝত না, তবে ধারণা ছিল যার যা ন্যায্য সম্মান, তা-ই দিতে হবে। সুতরাং প্রোটোকল বলে, দিদির বাড়ি সব্বার প্রথম যেতে হবে। দিদির যখন বিয়ে হয়, তখন পপন খুব ছোট। তবু দিদির ধারণা, তিনি জানেন, পপন কী ভালবাসে। তাই সিমায়ের পায়েস করেছিলেন। আসলে পপন এখন আর সিমাই দেখতে পারে না। অথচ দিদিকে তো আর তা বলা যায় না। একটু মুখে তুলতেই হল। কিন্তু তাতে দিদি খুশী হলেন না; বললেন, অন্য দিদিদের বাড়ি খাবার জন্য বুঝি জায়গা রাখছিস? আচ্ছা বড়রা এত বোকা হয় কেন? যদি ও সিমাই ভালবাসত তা হলেই কি ওর বেশী খাওয়া উচিত হত? দিদির ছেলেটাকে পপন খুব ভালবাসে। বাবলু ফুটবল-খেলা দেখতে ভালবাসে, আর পপন মাঝে-মাঝে ওকে খেলা দেখাতে নিয়ে যায়। কিন্তু এবার ও খুব মনমরা, ওর সাধের টিম মোহনবাগান পাঁচ গোলে হেরেছে। পপনেরও খুব খারাপ লেগেছিল, কিন্তু বাবলুর মুখ একদম শুকনো। ওর সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে পপন উঠল। জামাইবাবু অফিসে, দেখা হল না। বগলে একটা প্যাকেটে খুব সুন্দর শার্টের কাপড় দিয়েছে দিদি।

মেজদির বাড়ি বেশী দূরে নয়, ডানলপ ব্রিজের কাছেই। মেজদি বোধহয় দিদিদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী। ভারী মিষ্টি হাসি। অত্যন্ত নরম কোমল ব্যবহার। মেজ-জামাইবাবুও খুব ভাল। দারুণ হৈহৈ করেন। ওদের বাচ্চা-টাচ্চা নেই, তাই ওরা যখন-তখন বেরিয়ে পড়েন। মেজ-জামাইবাবুর কী একটা কারখানা আছে। সেখান থেকে ফাঁক পেলেই এক পাক ঘুরে আসেন। একবার পপনও গিয়েছিল। সেবার জামাইবাবু গেলেন বীরসিংহ গ্রামে। বোম্বে রোড ধরে গিয়ে পাঁশকুড়ার আগে একটা ডানহাতি রাস্তা; বেশ সরু। সেই রাস্তা ধরে গাড়ি চলতে লাগল। একসময় বীরসিংহ পেঁছল গাড়ি। একটা ঘুমন্ত গ্রাম। বিদ্যাসাগরকে পপন খুব ভক্তি করে। যখন তাঁর জন্মস্থানে গিয়ে পেঁছল, ওর কীরকম লাগতে লাগল। ও'র জন্মস্থানে একটামাত্র বাঁধানো ফলক আছে। দেখল মেজদির চোখেও মুগ্ধ দৃষ্টি। মেজ-জামাইবাবু অবশ্যি পাশের তেঁতুল গাছে ক্যায়সা তেঁতুল হয়েছে সেটাতেই বেশী উৎসাহিত বোধ করলেন। ফেরবার পথে ঘাটাল বলে একটা জায়গায় একটু নোংরা ধরনের হোটেলে দারুণ একটা খ্যাঁট হল।

ভাইফোঁটায় মেজদি ওকে একটা কলম দিলেন। সত্যি মেজদির বোধহয় মনের খবর জানবার যন্ত্র আছে। তা না-হলে দুদিন আগে যে ওর কলমটা খারাপ হয়ে গেছে, কী করে তা জানবেন? দুটি সন্দেশ খাওয়ালেন। আর দশটা টাকা দিলেন। বললেন, "আমাদের চার বোনের একটা মাত্র ভাই। আমার তোকে এইদিন অনেক খাওয়াতে ইচ্ছে করে। কিন্তু অন্যদেরও তো একই ইচ্ছা করে, তাই তোর ওপর জোর করব না। অন্য একদিন তোর মনের মতো দোকানে খেয়ে নিস্।" সত্যি মেজদিটা বড্ড ভাল। কিন্তু কেমন যেন দুঃখী-দুঃখী ভাব। পপন এটা কিছুতেই বোঝে না।

এবার সেজদির বাড়ি। বি-টি রোডের ওপর একটা হাউসিং এস্টেটে ওদের বাড়ি। সেজদির বাড়িতে আসতেই সেজ-জামাইবাবু একগাল হেসে বললেন, "এসো বড় কুটুম।" বিয়ের দিন থেকেই উনি ওকে বড়কুটুম বলে ডেকে আসছেন। সেজ-জামাইবাবু একটা বড় কারখানায় কাজ করেন। ও'র এখন সকালের শিফ্‌ট চলছে, তাই বাড়ি ছিলেন। সেজদি খুব ভাল রবীন্দ্রসংগীত গায়। সেজদি ষোড়শোপচারে বন্দোবস্ত করেছে। দিদিদের মধ্যে এই দিদিই ফোঁটা দেবার সময় নানারকম অদ্ভুত কাজ করে। কখনো হাতে ফল ধরায়। নানারকম জিনিস দিয়ে ফোঁটা দেয়। তার মধ্যে কাজলটা বড্ড বেশী দেয়। ওর ধারণা, কাজল দেখলে যম কিছুতেই কাছে ঘেঁষবে না। সেজদি ওকে একটা প্যান্টের কাপড় দিল। আর

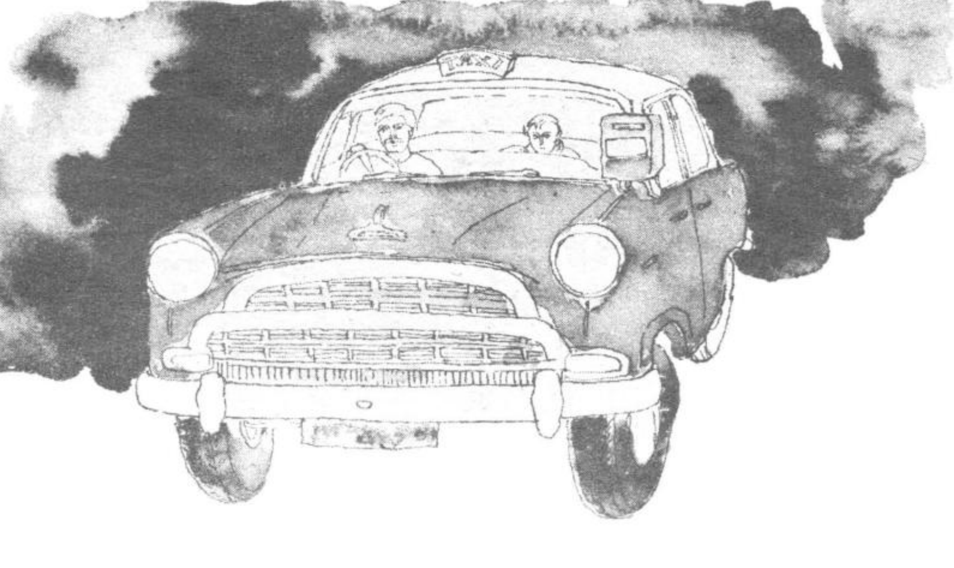

জোর করে খাইয়ে দিল লুচি আর মুরগীর মাংস। সেজদিটা ওইরকমই। এদিকে ফোঁটা দেবার সময় সব শাস্তর মানবে, কিন্তু খাওয়াবার বেলা মুরগী আর মাংসের বড়া। আসলে সেজদিই সত্যি জানে, পপন কী ভালবাসে। পপনের যখন দশ বছর বয়স, তখন সেজদির বিয়ে হয়েছে। হাতে দুটো প্যাকেট। সেজ-জামাইবাবু হাতে একটা কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগ ধরিয়ে দিলেন। বললেন, "রাখো বড়কুটুম, কাজ দেবে।"

বি টি রোডের ওপর এসে দাঁড়াল পপন। হাতঘড়িতে দেখল প্রায় সোয়া চারটে। ছোড়দির বাড়ি সেই বালিগঞ্জ। ছোড়দিকে নিয়েই পপনের যত মুশকিল। ছোড়দির বিয়ে হয়েছে সবে গত বছর। সুতরাং এতদিন ওরা একসঙ্গেই ছিল। পিঠোপিঠি ভাইবোন। চার বছরের তফাত। ছোড়দি এবার পার্টওয়ান দিয়েছে। নাচে ছোড়দির খুব নাম। কোন এক নাচের অনুষ্ঠানের শেষে ছোড়দির হবু শ্বশুর বাবার কাছে সম্বন্ধ করে। বাবার খুব মত ছিল না, কিন্তু মা-ই উদ্যোগী হয়ে বিয়ে দিয়ে দিলেন। যতদিন একসঙ্গে ছিল, ততদিন ছোড়দির সঙ্গে পপনের নিত্য ঝগড়া লেগে ছিল। কোথাও কিছু নেই, মার কাছে গিয়ে লাগাত পপনের নামে। গৌতমের সঙ্গে একদিন স্ট্যাম্প কিনতে গিয়েছিল পপন। গৌতম ওদের স্কুলের নামকরা ছেলে। ছোড়দি বোধহয় দেখতে পেয়েছিল। বাড়ি এসেই লাগাল মার কাছে। "মা, তোমার ছেলেটা গোল্লায় যাচ্ছে। আজ দেখলাম একটা বিশ্ববকাটে ছেলের সঙ্গে রাস্তায় ঘুরছে।" পপনের প্রচণ্ড রাগ ধরে যায়। কোন কথা ভাববার আগেই ছোড়দির বিনুনিটা কেমন করে জানি ওর হাতে চলে এল। আসলে কিন্তু বিনুনি টানতে ও চায়নি। কিন্তু একবার যখন এসেই পড়ল, তখন দিল এক টান। ছোড়দি যা একখানা চেঁচাল, বোধহয় যে বাবাও অফিস থেকে শুনতে পেয়েছিলেন। মার কাছে বকুনিও খেল খুব পপন। অথচ ছোড়দির দোষটা কেউ দেখল না। পৃথিবীটা সত্যিই অদ্ভুত। সত্যিই তাই, তা না হলে ওই পাজী রাক্ষুসী (এ সব ভাষা পপন মাঝে-মাঝেই ব্যবহার করেছে ছোড়দি সম্বন্ধে) মেয়েটা বিয়ে হয়ে চলে যাবার পর কেন এত কষ্ট হবে পপনের? বাড়িটা কেন এত ফাঁকা লাগবে? আর আজ সকালবেলা উঠে প্রথমেই কেন মনে হয়েছিল, ছোড়দি থাকলে সকালেই তার ফোঁটা বাড়িতে হত? মনে হতেই ওর মনে হল, ছোড়দির বাড়ি তাড়াতাড়ি পেঁছিতে হবে। মা ওকে ট্যাক্সির টাকা দিয়েছেন এই রাস্তাটুকু যাওয়ার জন্য। বাড়ি ফিরে খানিকটা পড়াশোনাও তো করতে হবে। পপন ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু কলকাতায় ট্যাক্সি পাওয়া অত সোজা নয়। কেউই দাঁড়াতে চায় না। কেউ গ্যারেজ যাচ্ছে, কারুর সারাদিন খাওয়া হয়নি। আরেকজন তো অতি খারাপ। সে বলল, "খোকা, তোমার কাছে অত টাকা আছে তো?" পপন কোন উত্তর দিল না। ক্লাস টেনে উঠতে চলেছে। তাকে খোকা বলবে? শেষে একটা ট্যাকসি থামল। ড্রাইভার পপনকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাবেন?" শুনে নিতেও রাজি হলেন। তারপর একটা অদ্ভুত কথা শোনালেন। "আমার ট্যাক্সিটা কিন্তু একটু ভুতুড়ে, আপনি যেতে চাইছেন নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কী হয় বলতে পারি না।" চারিদিকে আলো, বাস চলছে, গাড়ি চলছে তার মধ্যে ভূতের কথার মানে কী? পপন বলল, "সে আবার কী?" ট্যাক্সিওয়ালা বললেন, "উঠে পড়ুন, হয়ত কিছু হবে না।" পপনের মনে হল, লোকটা একটু পাগল।

গাড়ি চলল সারকুলার রোড ধরে। এখন নাম হয়েছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড। কত বড় নাম। হঠাৎ পপনের মনে হল, ইদানীং কালে নাম হলে বিদ্যাসাগর স্ট্রীটের নাম হত দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সরণি। ভাবতেই পপনের হাসি পেল। সত্যি কারা এমন নামকরণ করে। পপন বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিল। তাই কখন ব্যাপারটা হল টের পায়নি। যখন টের পেল, তখন দেখল গাড়িটা চলেছে একটা ফাঁকা রাস্তা দিয়ে। দুধারে ধানক্ষেত। ধান ফলে রয়েছে। কালো ধান। ও কখনো কালো ধান এর আগে দেখেনি। কিছুক্ষণ বাদে দেখল, শহর শুরু হয়েছে। একটা জায়গায় লেখা রয়েছে, শিবসাগর গড়কাপ্তানী অফিস। যাঃ বাবা, এ কোন জায়গা। বিরাট বিরাট দিঘি। সামনে মন্দির। মন্দিরের চুড়োয় হলুদ কলসী বসানো। ও দেখল, ট্যাক্সি-ড্রাইভারের চোখ প্রায় বোজা। পপনের ভীষণ ভয় হল। চেঁচিয়ে উঠল, "এ আমায় কোথায় এনে ফেললেন!" ট্যাক্সি ড্রাইভারের চটকা ভেঙে গেল যেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি আবার ফিরে এল এ পি সি রায় রোডে। পপন দারুণ অবাক হয়ে গেল। বলল, "কী ব্যাপার হল?"

ট্যাক্সি-ড্রাইভার বললেন, "বলেছিলাম না আমার ট্যাক্সিটা ভুতুড়ে? ওই হয়। আমার মনে যদি কখনো কোনো জায়গার কথা উদয় হয়, ট্যাক্সি অমনি সে-জায়গায় চলে যায়। আমার এক মাসতুতো বোনের কথা মনে পড়ছিল আপনার কপালে ফোঁটা দেখে। ভাইফোঁটা আমি প্রথম পেয়েছিলাম ওই বোনের কাছে। সে এখন শিবসাগরে থাকে। আমরা তাই শিবসাগর চলে গিয়েছিলাম।"

পপন বলল, "ভারী মজার তো। আপনি গাড়ি থামালেন না কেন? আমি নেমে দেখতাম। কালো ধান দেখলাম। এর আগে কখনো দেখিনি।"

ট্যাক্সি-ড্রাইভার বললেন, "আমার তো কোনো হুঁশ থাকে না, আমি দেখতে পাই না। তবে শিবসাগর আমি গেছি। ওই অঞ্চলে একরকম কালো ধান হয়। তার নাম জোহা ধান। খুব ভাল চাল হয়।"

পপন জিজ্ঞেস করল, "তাহলে আপনি জানেন গড়-কাপ্তানী মানে কী?"

"হ্যাঁ জানি। গড়কাপ্তানী হল পি-ডবলু-ডির ওইখানকার স্থানীয় নাম। আমরা পি-ডবলু-ডির কাছ অবধি গিয়েছিলাম কি?"

পপন উত্তর দিল, "আমরা একটা মন্দিরের কাছে গিয়েছিলাম।"

ট্যাক্সি ড্রাইভার বললেন, "হ্যাঁ ওই হচ্ছে বিখ্যাত শিবসাগরের মন্দির। ওপরে সোনার কলসী বসানো আছে। ওই মন্দিরের কাছেই আমার বোনের বাড়ি।"

পপনের বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা করছিল না যে, ও এইমাত্র শিবসাগর ঘুরে এসেছে। অথচ ও তো সত্যিই দেখেছে শিবমন্দির আর কালো ধান। ও ওইরকম কলস-বসানো মন্দির কখনো দেখেনি। ও ওইরকম কালো ধানও কখনো দেখেনি। কী করে হল? পপনের তখন ছোড়দির কাছে যাওয়ার তাড়া আর রইল না। ওর মনে হল এ তো দারুণ মজা। অধীর হয়ে ও জিজ্ঞেস করল,

"আপনি যেখানে খুশি যেতে পারেন এভাবে?"

উত্তর এল, "হ্যাঁ, আমি যে জায়গার কথা মনে করি সেখানেই চলে যাই।"

পপন বলল, "আমার ভীষণ কাশ্মীর যাওয়ার ইচ্ছা. আপনি একবার কাশ্মীরের কথা ভাবুন না। কিংবা বিলেত বা আমেরিকা।"

ভদ্রলোক বিষণ্ণ স্বরে জবাব দিলেন, "আমি তো কখনো ওসব জায়গায় যাইনি। ভাবলেও ট্যাক্সি যাবে না।"

পপন বলল, "বা, আপনার তো খুব সুবিধে। অনেক জায়গা ঘুরতে পারেন।"

ভদ্রলোক বললেন, "মোটেও না। খদ্দেররা আমায় মারতে ওঠে। রোজ তো আর শিবসাগর যাই না। যে শিয়ালদহ যাচ্ছে সে যখন দেখে দমদম আসছে, তখন গালিগালাজ করে। কেউ ভয় পেয়ে যায়। এ-ট্যাক্সিটা আমায় ছেড়ে দিতেই হবে।"

পপন ভেবেই পেল না কেন এ ট্যাক্সি ছাড়বেন ভদ্রলোক। ও আবার জিজ্ঞাসা করলল, "আপনি কোথায় গিয়েছেন শিবসাগর ছাড়া?"

ভদ্রলোক বললেন, "আমার জন্ম পাটনায়। সেখানে ছাড়া আর কোথাও যাইনি। ওই একবার একমাস শিব-সাগর ছিলাম।"

পপন বলল, "আপনি তাহলে পাটনার কথা ভাবুন।"

গাড়ি তখন শিয়ালদার ভিড় কাটিয়ে মৌলালীর দিকে এগোচ্ছে। ভদ্রলোক বললেন, "দেখি আপনার পাটনা দেখা হয় কিনা। গাড়ি মৌলালী পেরোল, এণ্টালি বাজার পেরোল। জোড়া গির্জা প্রায় এসে গেছে। ভদ্রলোক চুপ। পপন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এবার পপনের মাথা একটু ঘুরে গেল। খুব জোরে লিফট ওপর দিকে উঠলে যেমনটি হয়। তারপরই দেখল ওদের গাড়ি আর-একটা রাস্তা দিয়ে চলেছে। একদিকে প্রচুর বাঁশের গুদাম আর অন্য দিকে বিস্তৃত নদী। কী চওড়া। নদীর বুক দিয়ে একটা বিরাট স্টীমার চলেছে। এই সময়ে পপন একটা ভুল করল। "বাঃ কী সুন্দর" বলে হাততালি দিয়ে উঠল। ভদ্রলোকের চটকা আবার ভেঙে গেল। গাড়িও চলে এল বেকবাগানে।

ভদ্রলোকের বোধহয় পপনকে বেশ ভাল লেগেছিল। তিনি বললেন "কী দেখলে? গঙ্গার ঘাট?" এই প্রথম উনি তুমি বললেন।

পপন বলল, "কই আর দেখলাম! একটু ভাল করে দেখতে গিয়েছি, অমনি তো বেকবাগান এসে পড়ল।"

পপনের নতুন জায়গা আর দেখা হল না। ভদ্রলোক অবিশ্যি পপনকে খিদিরপুর, বেহালা, গড়িয়া - এইসব জায়গায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পপন ছোড়দির বাড়িই এল।

ছোড়দি এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। ট্যাক্সির বিল মিটিয়ে আসতেই সোজা খপ করে নিয়ে গিয়ে আসনে বসিয়ে দিল। বলল, "আর মাত্র আড়াই মিনিট দ্বিতীয়া আছে। তুই সারাজীবন আমায় জ্বালিয়েই গেলি।"

পপন ফোঁটা নিয়েই বলল, "দাঁড়া, আরও একজনকে ফোঁটা দিতে হবে।" ছুটে বেরিয়ে এসে দেখল— ট্যাকসিটা চলে গেছে। বোধহয় এখন শিবসাগরের সেই মন্দিরের ধারে আবার পৌঁছে গেছে। তখন পপনের খেয়াল হল, ভদ্রলোকের নাম-ঠিকানা কিংবা ট্যাক্সির নম্বর কিছুই রাখা হয়নি।

বড় হয়ে ওঠার খুসীতে এই মেয়েটির মন ভরপুর। আপনার কন্যা ও পুত্র এই মেয়েটির মতোই নিশ্চিত যে তাদের ভবিষ্যতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা, বিবাহ সব-কিছুরই সুব্যবস্থা আপনিই করবেন। সানন্দে এই দায়িত্ব পালন করতে এখন থেকেই আপনি উন্মুখ। তাই না?

আপনার পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ সুখী ও নিশ্চিন্ত করতে আমাদের যে কোন সঞ্চয় প্রকল্প থেকে আপনার সঞ্চয়ের আয় অনেক গুণ বাড়িয়ে তুলতে পারেন।

আমাদের ১০,০০০ টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনলে ২৫ বছর পরে আপনি পাবেন ১,২০,৫০০ টাকা। তাছাড়া রয়েছে আমাদের ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট, এণ্ডাওমেন্ট বেনিফিট ডিপজিট, মাসিক আয় সার্টিফিকেট, রেকারিং ডিপজিট এ্যাকাউণ্ট প্রভৃতি নানা সঞ্চয় প্রকল্প।

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন:

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস: ৭, রেড ক্রস প্লেস
কলিকাতা-৭০০০০১ ● টেলিফোন: ২৩-১৭৮৪ (৩টি লাইন)

॥ অথবা আমাদের যে কোন শাখা অফিস ॥

Progressive/UIB

তোমাদের কলকাতা

বহুদিন আগে একজন নামকরা লোক কবিতার একটি লাইনের মধ্য দিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন "ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা সব, কি দিয়ে হয় তৈরী?" তার জবাবটা অবশ্য ছিল চিনি মাখন ছানা এই সব দিয়েই নাকি ছেলেমেয়েরা তৈরী হয়। আজকাল কিন্তু ছেলে-মেয়েরা একদম অন্যরকমভাবে তৈরী হয়। মা বাবারা অবশ্য বলেন যে, ছেলেমেয়েদের পুরোটাই দুষ্টুমী। কিন্তু আমরা তো জানি আজকালকার ছেলেমেয়েরা কত দিক দিয়ে চৌকশ।

এই কলকাতা শহরেই ধর না কেন, ছেলেমেয়েরা এই শহরটা সম্বন্ধে যত চিন্তা করে, বড়রা তার একাংশও করেন না।

তার একটা অবশ্য কারণ আছে বড়রা ভাবেন তাঁদের দিন তো ফুরিয়ে এল, আর ছোটরা জানেন যে এই শহরই তাঁদের ভবিষ্যৎ।

ভবিষ্যতের এই কলকাতার রূপরেখা কি? এই শহরটাকে কেন্দ্র করে তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ভরসা ভাবনা যে কি সেটা তোমাদের মুখ থেকেই শুনতে চাই। কারণ বড়দের মুখ থেকে হতাশা ছাড়া আশার কথা বড় একটা শুনি না।

কিছুদিন আগে যাদবপুরের দিকে একটা স্কুলে শুনেছিলাম যে ছাত্ররা স্কুলের পরে নিজেরা জমায়েত হয়ে পড়াশোনা নিয়ে আলোচনা করে, একসঙ্গে খেলা-ধুলো করে, আর একে অপরকে বইপত্তর দিয়ে সাহায্য করে। সেখানে গরীব বড়লোক, ভালছেলে খারাপছেলে এরকম কোন ভেদাভেদ নেই। নরেন্দ্রপুরে দৃষ্টিহীন ছাত্রদের সঙ্গে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্য-ছেলেরা। কিছুদিন আগে ওখানেই একজন দৃষ্টিহীন কর্মীর সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। আসেন হাওড়া জেলার ভেতর থেকে, হেঁটে, ট্রেনে, বাস বদল করে (রোজ করেন তাই)। কোন অসুবিধে হয় না? হেসে জবাব দিলেন, 'কলকাতায় সবাই সবাইকে সাহায্য করে'। আর আমরাও জানি যে এ ব্যাপারে ছেলেমেয়েরা আরও বেশী সাহায্য করেন।

তুলনাটা ঠিক এরকম না হলেও শহর কলকাতাকেও অনুরূপভাবে সাহায্য করতে হয়। কেন-না নাগরিক সাহায্য না পেলে কোন শহর দৃষ্টিহীনের মতই বিপদে বা বিপথে পড়তে পারে। শহর বড় হচ্ছে এটাই বড় কথা নয়, শহরটা ভাল হচ্ছে কি না সেটাই দেখবার বিষয়। আর একটা শহর ভাল হয় যদি উন্নয়ন সংস্থাগুলি জল সরবরাহ, জল ও মল নিকাশী ব্যবস্থা, পথ এবং পরিবহণ ইত্যাদি ব্যাপারে সক্রিয় হয়। তোমরা বোধহয় জান যে সি এম ডি এ নামক সংস্থাটি গত পাঁচ বছরে বৃহত্তর কলকাতার প্রভূত উন্নতি করেছে এবং করে চলেছে। সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রীভোলানাথ সেন নাগরিকদের কাছ থেকে ধন্যবাদ দেওয়া চিঠি যেমন পান তেমনি অন্য চিঠিও পান। সবারই কিন্তু বক্তব্য এক। আরও উন্নতি চাই।

কিন্তু শহর উন্নতির মধ্যে কেবল এগুলিকে ধরলেই চলবে না। এখানকার লোক, এখানকার সমাজ, এখানকার সাংস্কৃতিক জীবন, কাব্য, সাহিত্য, নাটক সব মিলিয়ে একটা সচেতনতা থাকা দরকার। অর্থাৎ একদিকে কাজ যেমন চলবে অন্যদিকে শহরের লোকেরা শহরটাকে মনের দিক দিয়ে, সংস্কৃতির দিক দিয়ে এবং পরস্পরকে সাহায্য করে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, এটাই কাম্য।

তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে কলকাতায় অপরাধের সংখ্যা ভারত কেন পৃথিবীর অন্যকোন শহরের চেয়ে কম। অবশ্য দারিদ্র্য এবং অভাবের জন্যই যে কিছু অপরাধ হয় সেটা নিশ্চয়ই তোমরা স্বীকার করবে। এখন প্রয়োজন হচ্ছে শুধু শহরের উন্নতি নয় সারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি। কলকাতাকে কেন্দ্র করে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় ভারতবর্ষের বিরাট এক অঞ্চল গড়ে উঠেছে এবং বিকাশ লাভ করছে। কাজেই কলকাতার উন্নয়নের সঙ্গে সমগ্র ভারতের উন্নয়নও জড়িয়ে আছে।

কোন সময়ই থেমে গেলে চলবে না। আরও উন্নতি দরকার। আরও চেষ্টা দরকার। আরও নাগরিক সহযোগিতা দরকার।

তোমরা হচ্ছ ভবিষ্যতের নাগরিক। আজ যদি তোমাদের মনটা ঠিক মত তৈরী না হয় তাহলে ভবিষ্যতে তোমাদেরই অসুবিধে হবে। তোমাদের কলকাতারই বদনাম হবে।

গতবার প্রশ্ন করেছিলাম, যে কলকাতায় তোমাদের বাস, সে কলকাতা সম্বন্ধে তোমরা কতটুকু জান? এখনও কোন ভাল উত্তর পাইনি। একবার হিসেব করবার চেষ্টা কর-তো, কলকাতায় স্থায়ীভাবে কত জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম এবং ভাষাভাষী লোক আছে? অবাক হয়ে যাবে যে কত লোক এই শহরটাকে একান্ত নিজের বলে আঁকড়ে ধরে আছে।

সেদিন মস্কো শহরের গল্প শুনছিলাম। একটা কলা খেয়ে একটি ছেলে কলার খোসাটি পকেটে পুরল। উদ্দেশ্য যেখানে ময়লা ফেলার জায়গা দেখবে সেখানে ফেলবে। এরকম দৃষ্টান্ত কি কলকাতায় পাওয়া যায়?

যায়। মজার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। রেলের কামরায় একজন গাট্টা-গোট্টা লোক, একের পর এক কলা খাচ্ছে আর কামরার ভেতরেই খোসা ফেলছে। একজন রোগা-পটকা লোক প্রতিবাদ করাতে গাট্টা-গোট্টা বললো, বেশ করেছি, ফেলেছি। কি করবে তুমি?

'কি করবো দেখবে?'

'হ্যাঁ, দেখবো'। সমস্ত কামরা নিস্তব্ধ। এই বুঝি গাট্টা-গোট্টা রোগা-পটকাকে পিষে ফেলে।

কোনও কথা না বলে, রোগা-পটকা কলার খোসাগুলি তুলে নিয়ে ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলো।

ঘটনাটি সত্যি। ঘটে হাওড়া-ব্যাণ্ডেল লাইনে।

রত্নাকর

আমাদের কলকাতা

প্রিয় মেজদি,

এই মাত্তর বাড়ি ফিরেছি, ফিরেই তোমাকে চিঠি লিখতে বসে গেছি। ভেবেছিলাম কাল তোমাকে চিঠি লিখব, কিন্তু কাল পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। এত সুন্দর একটা জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম মেজদি, কী বলব তোমাকে! জায়গাটার নাম বিধান শিশু উদ্যান। ভি আই পি রোডের গায়ে লাগানো। ছোটমামা বলল, একে উদ্যান না বলে মহা-উদ্যান বলা উচিত। উদ্যানের মধ্যে যাচ্ছি তো যাচ্ছিই, শেষ আর হয় না। খেলার মাঠ, পুকুর, ফুলের বাগান, পিকনিক করার জায়গা—আরও কত কী। একসঙ্গে অনেক—অনেক ছেলেমেয়ে খেলা করছে। কী মজা লাগে দেখতে। আমি আর মীনু কিছুক্ষণ দোলনায় চড়লাম। মীনু তো দোলনা থেকে নামতেই চাইছিল না।

পারকের মুখেই একটা সাদা দোতলা বাড়ি। ওই বাড়িতেই শিশু উদ্যানের অফিস। অফিস শুনে আমার ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না। ছোটমামা বলল, "চল না, দেখি আর কী-কী আছে।" ঢুকতেই দেখি দেয়ালে কত সুন্দর-সুন্দর ছবি টাঙানো। সব নাকি ছোটদের আঁকা। পাশেই একটা ঘরে ছোটদের জন্যে কী বিরাট লাইব্রেরি। কত বই—সব ছোটদের। ছোটদের বসার জন্যে ছোট-ছোট চেয়ার। এখান থেকে পছন্দমত বই বেছে নিয়ে দোতলার ঘরে বসে পড়া যায়। দোতলার ঘর-টাও দারুণ সুন্দর। এখানে বসে পড়ার জন্যে এক পয়সাও চাঁদা দিতে হয় না। তবে বাড়িতে বই নিয়ে যেতে হলে পাঁচ টাকা লাগে। তাও মোটে একবার। কী-রকম বলছি শোন। মীনুর তো ঠিক পাঁচ বছর বয়েস। ও যদি এখন লাইব্রেরির মেমবার হয় তাহলে ওই পাঁচ টাকা চাঁদাতেই ও চোদ্দ বছর বয়েস পর্যন্ত বাড়িতে বই নিয়ে গিয়ে পড়তে পারবে। খেলা-ধুলো করার জন্যে একেবারেই চাঁদা লাগে না। নানারকম খেলার ব্যবস্থা আছে—যেমন, কাবাডি, খোখো, বাস্কেট বল, ভলি। ফুটবল, ক্রিকেট আর হকির মাঠ তৈরি হচ্ছে। আর তৈরি হচ্ছে সাঁতার কাটার জায়গা। শিশু উদ্যানের মেমবার হতে হলে চোদ্দ বছরের বেশি বয়েস হলে চলবে না। সাদা বাড়িটার ভেতরে চমৎকার একটা মঞ্চ আছে। সামনে শ' পাঁচেক লোকের বসার জায়গা। বাইরে, পার্কের মধ্যে আর-একটা ছাদ খোলা মঞ্চ আছে। আর কত লিখব মেজদি, এত চমৎকার জায়গার কথা লিখে বোঝানো যায় না। তুমি দেখলে অবাক হয়ে যাবে। তুমি যখন কলকাতায় আসবে তখন সবার আগে তোমাকে বিধান শিশু উদ্যানে নিয়ে যাব। ছোটমামা বলেছে, আমাকে আর মীনুকে ওখানকার মেমবার করে দেবে। তুমি আর জামাইবাবু আমার প্রণাম নিও, আর বুবুনকে দিও আমার ভালোবাসা।

তোমার শমী

বেতমিজ...
বদমাস...গাঁজাখোর...গুণ্ডাহাতি!
টিনটিন !!
?
টাকডুমাডুম
ও, তুমিই টিনটিন! এইবারে এক গুলিতে তোমার খুলি উড়িয়ে দেব!
ওহে খোকা, বন্দুক নিয়ে খেলা করতে নেই! টাকডুমাডুম!
?
দুম!
আঃ!
কে এই লোকটা?
ওমর বেন সালাদ! ও'কে প্রশ্ন করতে বললেন, উনি সম্পূর্ণ নির্দোষ...
চেপটে গেলুম যে!
নির্দোষ? ওর গুদামে একটু আগেই বিস্তর আফিঙের খোঁজ পেয়েছি!
দেখুন! কাঁকড়ার দাঁড়া! সোনার! এই ব্যাটাই পালের গোদা! এক্ষুনি পুলিশকে খবর দিন!
হ্যাল্লো...পুলিশ? আমরা পুলিশের গোয়েন্দা! বিস্তর তদন্ত করে আফিঙের চোরাকারবারীদের খোঁজ পেয়েছি...হ্যাঁ...তাদের নেতা হচ্ছে ওমর বেন সালাদ...
কী বললেন? ওমর বেন সালাদ? তিনি তো মস্ত ব্যবসায়ী! আপনারা কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?
ঠাট্টা নয়, তাকে ধরেছি। কথাটা সত্যি না হলে আমাদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়!
যা বলেছ!

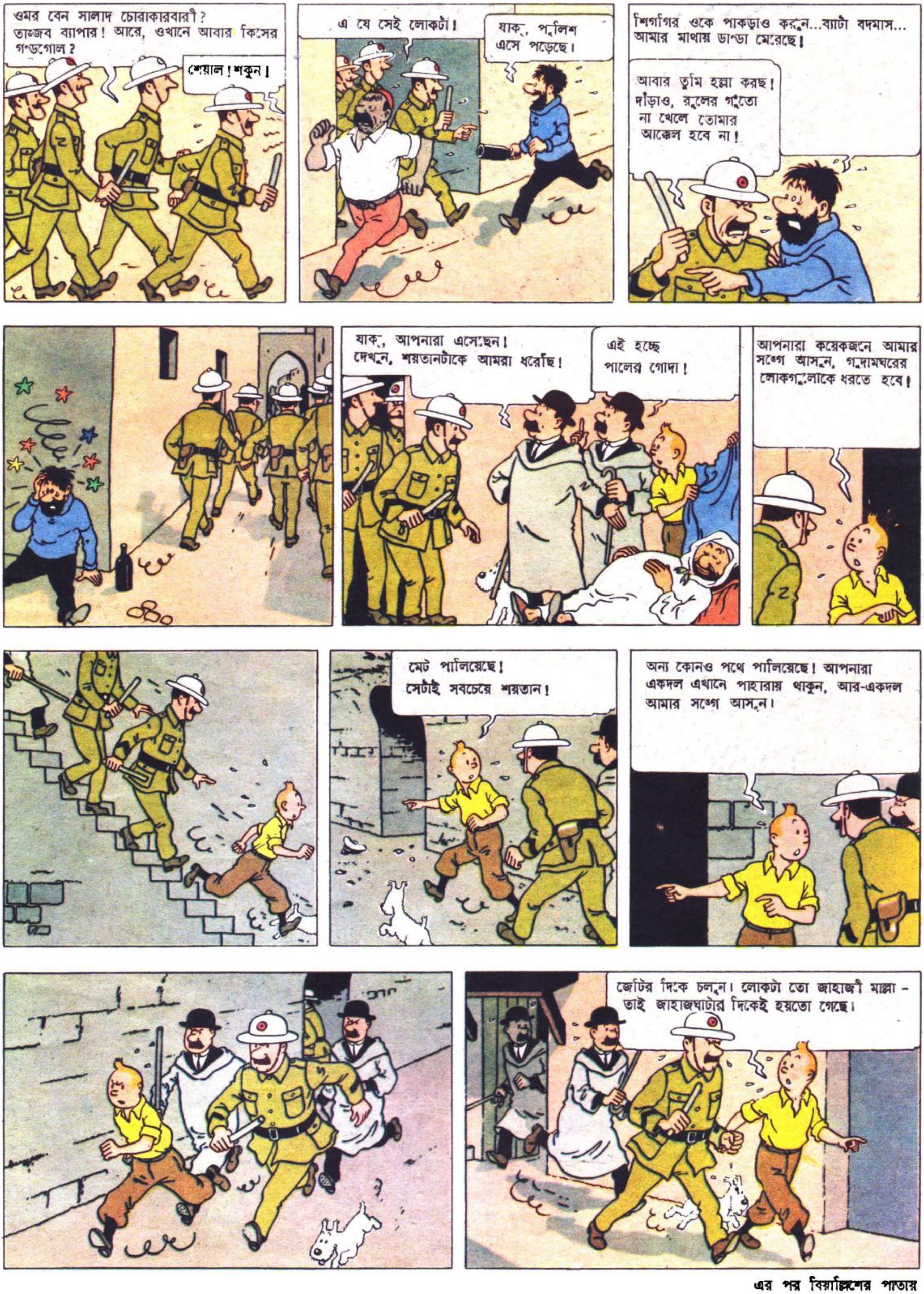

এর পর বিয়াল্লিশের পাতায়

শেখো

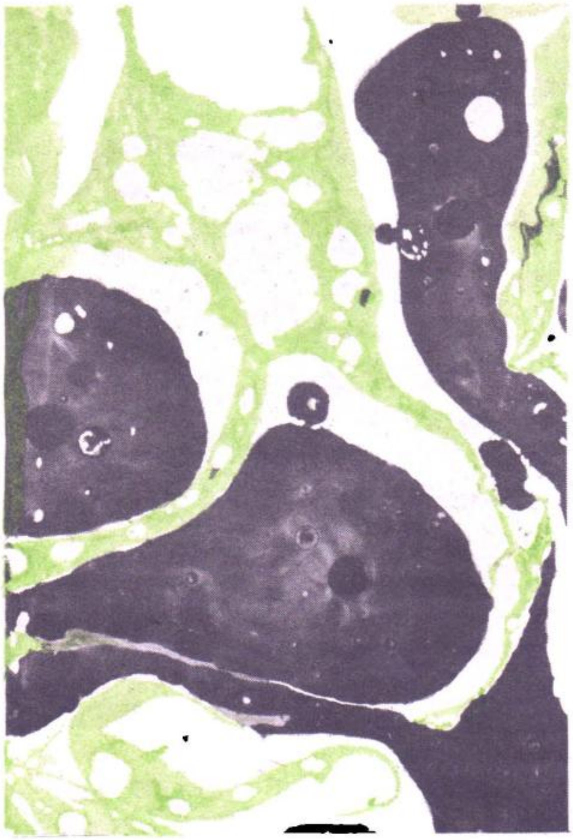

ছোপ-কাগজ বা মার্বেল পেপার।

কাজ শুরু করার আগে জোগাড় করো (১) মাটি এনামেল বা টিনের চ্যাপটা গামলা, (২) নানান রঙের তেল রং, (৩) কেরোসিন, (৪) সাদা কাগজ, (৫) তুলি, (৬) কিছু রং গোলার বাটি আর (৭) এক টুকরো কাঠি।

এবার শুরু করো। এমনভাবে গামলা জলে ভর্তি করো যাতে একটু নাড়লেই পড়ে না যায়। তোমার হাতের কাছে রাখা বাটিতে তেলরং দরকারমত সামান্য কেরোসিন দিয়ে পাতলা করে, তুলির ডগায় রং তুলে, আস্তে করে ছিটিয়ে দাও গামলার জলে। নানান রঙের বাহার আনতে চাইলে একের পর এক রং ছিটোবে। দেখবে কত সব নকশা আপনা থেকেই ভেসে উঠছে জলের ওপর, ঠিক যেমন আকাশে মেঘের দল নানান নকশায় জাজিম পেতে যায়। যে-নকশা তোমার মনে ধরবে, চট করে পাশে রাখা কাগজ আলতো-ভাবে জলের ওপর ফেলেই তুলে নাও। দেখবে সাদা কাগজ কত না-জানা, না-দেখা রূপে অপরূপ হয়েছে।

যদি জলে ভাসা নকশা পছন্দ না হয়, কাঠি দিয়ে সামান্য নেড়ে তার রদবদল করতে পারো। এমনভাবেই তুমি নানান আকারের কাগজে, নানান নকশার ছোপ-কাগজ বা মার্বেল পেপার তৈরী করে, বইয়ের মলাট, খাম, চিঠির কাগজ আর কার্ডবোর্ডের বাক্সে ব্যবহার করো।

জেনে রাখো—(১) গাঢ় রং জলে ছাড়বে না, (২) তুলি না পেলে কাঠির মাথা থেঁতলে ব্যবহার করো। (৩) তেল রং ছাড়াও বাজারে খুব ছোট টিনে এনামেল রং পাবে। ব্যবহার করেই কৌটোর মুখ ঢাকবে। (৪) কাজের শেষে তুলিটাকে প্রথমে কেরোসিন ও পরে সাবান দিয়ে না-ধুলে শক্ত হয়ে যাবে। (৫) একই তুলিতে সব রঙের কাজ করতে চাইলে প্রত্যেকবার কেরোসিনে ধুয়ে নেবে। (৬) ছোপের জন্য কাগজ এক দিকেই ভিজবে। (৭) ছোপ কাগজ জল থেকে তুলে শুকোতে দেবে।

একাজে সবচেয়ে মজার ব্যাপার দেখবে—একটি নকশা অপরটির মত দেখতে হবে না কিছুতেই। শেষে বলি, সম্ভব হলে একটু রুপোলী আর সোনালী রঙের ছোঁয়া দিয়ে দ্যাখো না কী বাহার হয়।

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

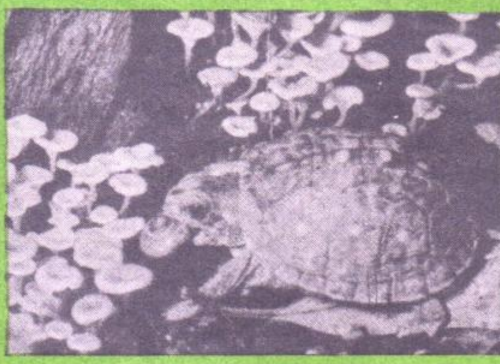

কচ্ছপ

কচ্ছপের কামড় বড় শক্ত কামড়। বলতে কী, এত মারাত্মক কামড় খুব কম প্রাণীই দিতে পারে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, এই কামড় দেওয়ার জন্য এদের চোয়ালে কোন দাঁত নেই। দাঁতের বদলে চোয়ালের উপর শক্ত দুটি পাত থাকে কচ্ছপের।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই কচ্ছপকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত। পুরাণের গল্পে আছে, কচ্ছপ পিঠে করে এই পৃথিবীটাকে ধরে রেখেছে। হিতোপদেশের গল্পে দেখা যায়, প্রাণের দায়ে কচ্ছপকে পালাতে হয়েছিল দুটো হাঁসের সাহায্য নিয়ে। হাঁস দুটো একটি কাঠির দুদিক তাদের চঞ্চু দিয়ে কামড়ে ধরেছিল, আর কচ্ছপ কামড়ে ধরেছিল সেই কাঠির মাঝখানটা। নীচে রাখাল-বালকেরা হৈচৈ করে উঠলে কচ্ছপ বোকার মতো মুখ খুলে কী বলতে গিয়েছিল, বাস্, অমনি পপাত ধরণী তলে! ঈশপের গল্পে দাম্ভিক খরগোশ যে কচ্ছপের সঙ্গে দৌড় দিতে গিয়ে হেরে ভূত হয়েছিল তা আর কে না জানে?

জল ও স্থল দু জায়গাতেই এরা অবাধে চলাফেরা করতে পারে। ডাঙায় প্রয়োজনমতো বন-বাদাড় ভেঙে গট্‌গট্ করে চলতে এবং জলের নীচে সাঁতার কাটতেও এরা ওস্তাদ। যে-সব কচ্ছপ নদীতে বাস করে, তাদের বলা হয় টার্টল, এদের আকার বেশ বড়। আর-এক শ্রেণীর কচ্ছপ পুকুর, বিল বা খানাডোবার মধ্যে বাস করে। এদের কেউ-কেউ আবার জলের চাইতে ডাঙায় বাস করাটাই বেশি পছন্দ করে। ইংরেজীতে এদের বলে টর্টইজ।

কচ্ছপ সরীসৃপজাতীয় প্রাণী। এদের দেহটা মোটা একটা হাড়ের খোলের মধ্যে ঢাকা থাকে। কোন শত্রু আক্রমণ করলে এরা খুব সহজই নিজের মাথা ও পা ঐ হাড়ের খোলের বর্মের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে মড়ার মতো পড়ে থাকে। বর্ম না বলে দুর্ভেদ্য দুর্গও বলা যায়। এদের চেহারা দেখেই বোধ হয় আবিষ্কার করা হয়েছে দুর্ভেদ্য ট্যাংক, যেটা যুদ্ধক্ষেত্রের মারাত্মক হাতিয়ার।

কচ্ছপ ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়। অনেক সময় পুকুর অথবা নদীর কচ্ছপকে শ্বাস নেওয়ার জন্য প্রায়ই জলের উপরে ভেসে উঠতে দেখা যায়।

চাথাম দ্বীপে গিয়ে এক সাহেব-বিজ্ঞানী প্রথম কচ্ছপ দেখতে পেয়েছিলেন। ঠাট্টা করে তিনি বলেছিলেন, সাপই নিষ্কর্মা থেকে থেকে কচ্ছপ হ'য়ে গিয়েছে। সে যাই হোক, এই নিষ্কর্মা প্রাণীটির মধ্যেও কিন্তু প্রচুর রসজ্ঞান আছে। খাঁখাঁ রোদ্রের মধ্যে যখন কোন সম্মানীয় ব্যক্তি মাছ ধরবার জন্য ছিপ ফেলে উন্মুখ হয়ে বসে আছেন, তখন হয়তো ফাত্‌নাটা হঠাৎ ডুবে গেল। সব্বাই ভাবছে, একটা প্রকাণ্ড রুই-ই হয়তো উঠবে। কিন্তু হায়, দেখা গেল, একটা কচ্ছপ তার হাত-পা ছড়িয়ে উঠে পড়েছে ছিপের মাথায়!

কচ্ছপ মাটির নীচে গোল-গোল ডিম পাড়ে। গোসাপ, বেজী প্রভৃতির হাত থেকে যে-সব ডিম রেহাই পায়, তারাই একদিন বাচ্চা কচ্ছপ হয়ে মাটির উপরে উঠে আসে। গিনিপিগ, খরগোশ বা বেজীর মতো কচ্ছপও অনেকে পুষে থাকেন।

পার্থসারথি চক্রবর্তী

ভাবতে পারো? রিপলি

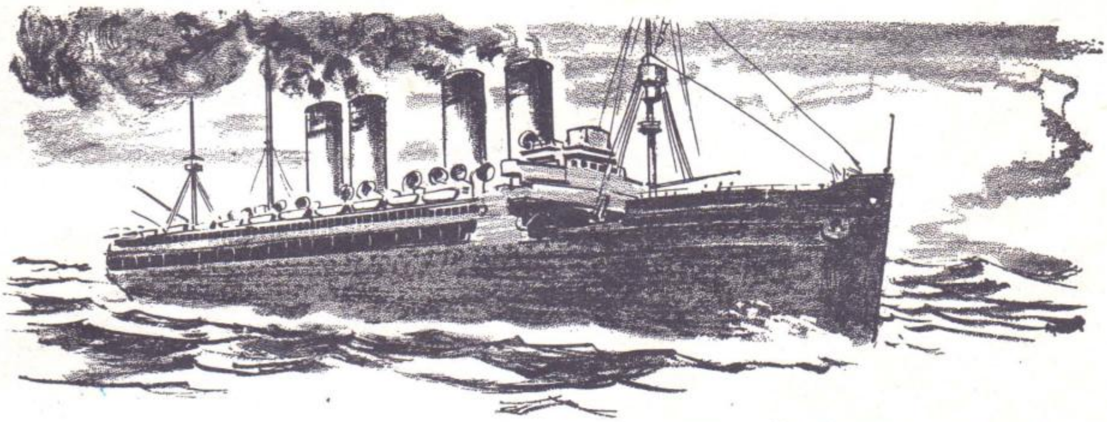

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মালবাহী জাহাজ ইউ এস এস মাউণ্ট ভারনন্। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ওই জাহাজের নাবিকেরা প্রতি বছর ম্যাসাচুসেট্সের বস্টন বন্দরে একবার করে নিজেদের মধ্যে পুনর্মিলনের আয়োজন করে আসছে।

ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেম্স (১৬৩৩-১৭০১) তাঁর চারজন ছেলেকেই পরপর কেম্ব্রিজের ডিউক উপাধিতে ভূষিত করেন। কেননা এই চারজন তরুণ ডিউকই খুব ছেলেবেলায় মারা যান।

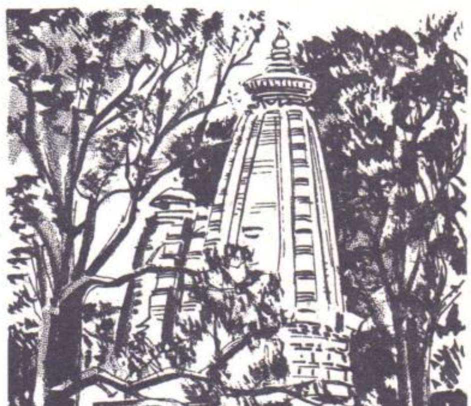

ভারতবর্ষের রেওয়া জঙ্গলের মধ্যে নর্মদা-মন্দির। গত একশো বছরের মধ্যে এই মন্দিরের চারজন সেবায়েত বাঘের পেটে গিয়েছেন।

© King Features Syndicate, Inc., 1974. World rights reserved.

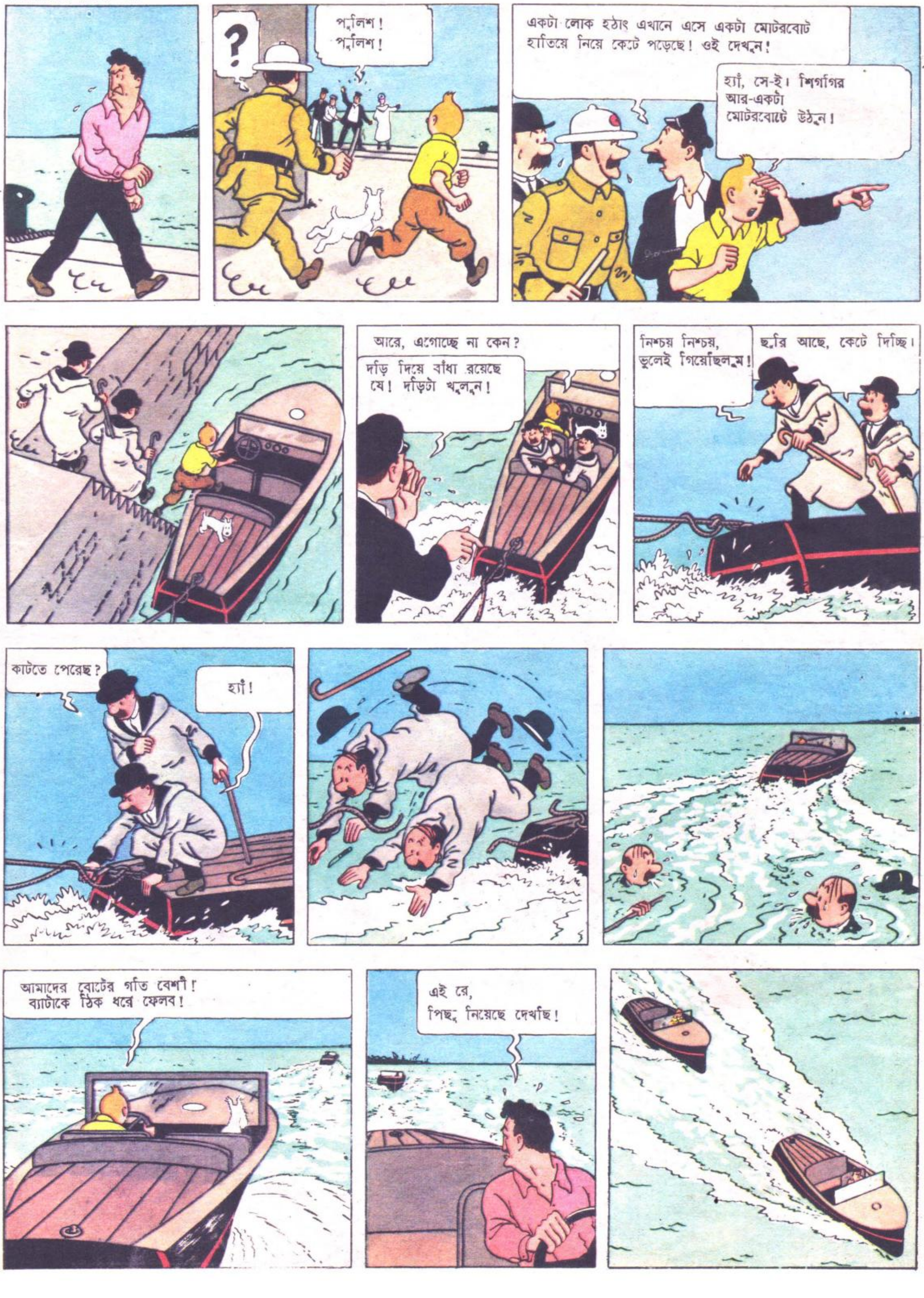
পুলিশ!
পুলিশ!
?
একটা লোক হঠাৎ এখানে এসে একটা মোটরবোট হাতিয়ে নিয়ে কেটে পড়েছে! ওই দেখুন!
হ্যাঁ, সে-ই। শিগগির আর-একটা মোটরবোটে উঠুন!
আরে, এগোচ্ছে না কেন?
দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে যে! দড়িটা খুলুন!
নিশ্চয় নিশ্চয়, ভুলেই গিয়েছিলুম!
ছুরি আছে, কেটে দিচ্ছি।
কাটতে পেরেছ?
হ্যাঁ!
আমাদের বোটের গতি বেশী! ব্যাটাকে ঠিক ধরে ফেলব!
এই রে, পিছু নিয়েছে দেখছি!

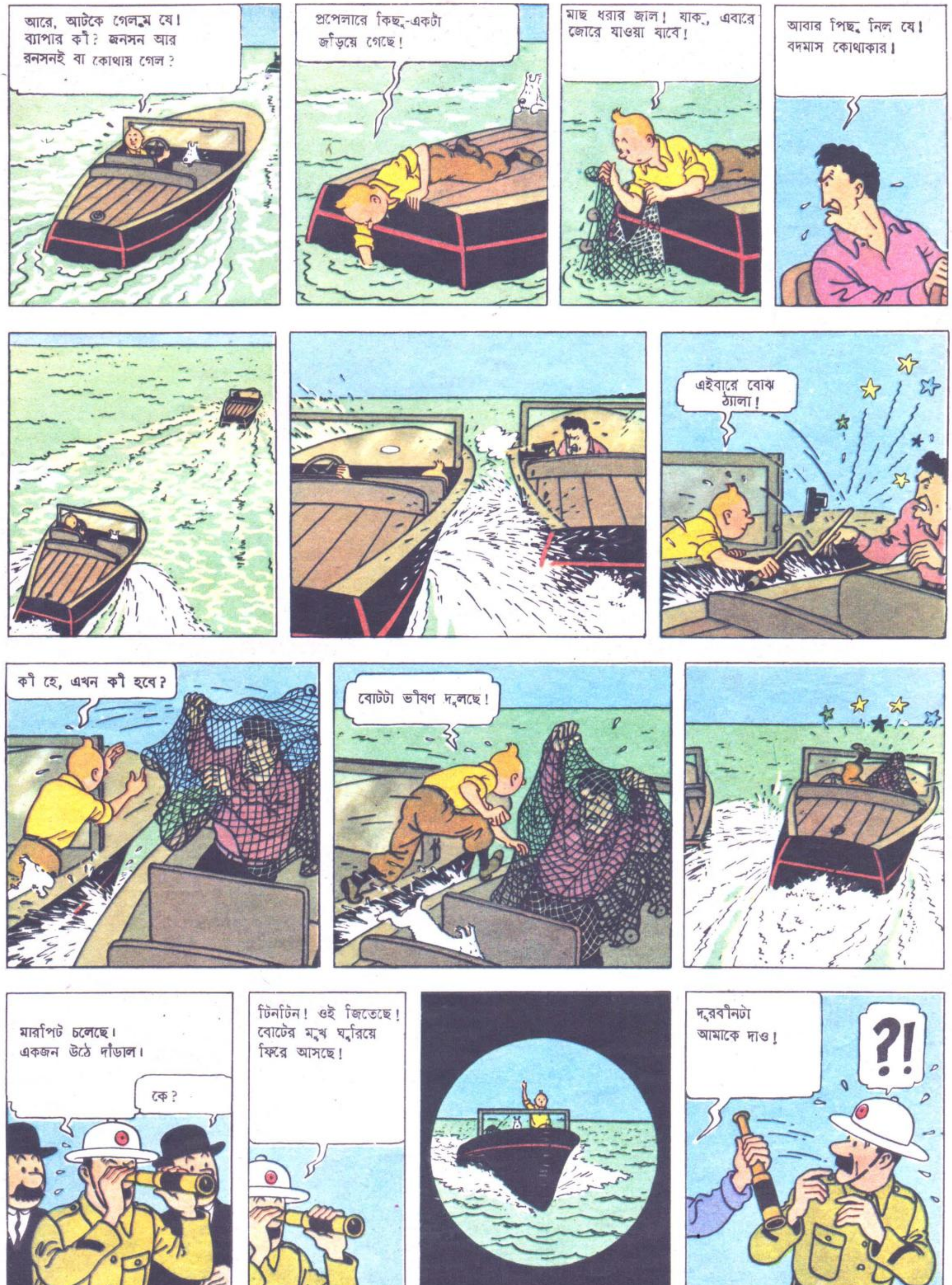

এর পর আগামী সংখ্যায়

কার ঘাড়ে কটা মাথা

এই দেখো কাকু, কৃত্তিবাসের রামায়ণে কী লেখা আছে দেখো।

কী আছে?

দেখো, 'ধূর্জ্জটি বলেন মম বাক্যে দেহ মন।' ধূর্জ্জটি বানানে কী লিখেছে? দুটো জ নেই?

আছে তো।

তবে যে সেদিন বললে, 'অর্জুন' কথাটার মধ্যে কোনো ভুল নেই? অর্জুনেও কেন তাহলে দুটো জ হবে না? এটার বেলায় একরকম, ওটার বেলায় একরকম, তা কখনো হয়?

ও, এই কথা! এটা খুব সোজা কথা। শোন্। জ-এর ঘাড়ে ওই যে রেফ দেখছিস, ওইটে দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবি।

ব্যাপার আবার কী?

ব্যাপার হলো, রেফের সঙ্গে অন্য কোনো ব্যঞ্জন থাকলে সেটা ডবল হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু...

নন্তু হঠাৎ ফোড়ন কেটে বলল : কিন্তু ব্যঞ্জন মানে যে তরকারি নয়, সেটা ওকে বলে দেবে কে?

ঘাড় বাঁকিয়ে বলল টুম্পি : আহা, ব্যঞ্জন আমি জানি না, না? অ আ ই, এরা হলো স্বর। তুমি যেন ভেবো না দুধের সর। আর ক খ গ, এরা হলো ব্যঞ্জন। কে না জানে এসব?

নন্তু শুধুই গোলমাল করছ। চুপ করে শোনো তো। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। রেফের পর থাকলে দুটো ব্যঞ্জনই হবার কথা, একে বলে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব। তাই এ-রকম তো লেখাই যায়, অর্জ্জুন কর্ম্ম কর্ত্তা অর্চ্চনা মূর্চ্ছা সূর্য্য

দাঁড়াও দাঁড়াও। সূর্য্যে আবার দ্বিত্ব পেলে কোথায়? ওর মধ্যে কি দুটো য আছে?

নেই? য-ফলাটা তাহলে কী? অন্যরকম চেহারায় আছে বলে বুঝতে পারছিস না, না?

টুম্পি একটু লজ্জা পেল এবার। বলল : এ মা। ভুলে গিয়েছিলাম একেবারে।

এখন, এইরকমই তো হয়, কিন্তু এ-রকম না হলেও সেটা ভুল নয়। ম-এর ঘাড়ে ম, তার উপরে রেফ; চ-এর ঘাড়ে চ, তার উপরে রেফ। দু-দুটো করে আসছে কোথা থেকে? এই শব্দগুলিকে তো আর 'উজ্জ্বল'-এর মতো ভাঙা যায় না। তাহলে এত হাঙ্গামার দরকার কী? পুরোনো দিনে নিয়ম ছিল যে রেফের পর একটা ব্যঞ্জনও লেখা চলে। ভুল যদি না হয় তাহলে সেইটেই তো সোজা। আগে সবাই এই সোজাটা লিখতেন না বটে, কিন্তু এখন প্রায় সবাই এটা মেনে নিয়েছেন। এখন একজনের ঘাড়ে একটা মাথা। জ-এর ঘাড়ে রেফ, ব্যস্, হয়ে গেল অর্জন বা অর্জুন বা বর্জন।

তাহলে আমি এ-রকম লিখলে কেউ ভুল বলবে না তো?

কেন বলবে ভুল? শুধু খেয়াল রাখবি, সব সময়ে যেন একই রকম হয়। যদি লিখিস, 'অর্জুন একবার অস্তগামী সূর্য্যের দিকে তাকালেন, তাহলে কি ভালো হবে? একবার অর্জুন, একবার সূর্য্য?

না, লিখব না তা। তবে, প্রথম-প্রথম দু-একবার কিন্তু গোলমাল হতে পারে।

তা তো হবেই। সে-গল্প জানিস না বুঝি? রবীন্দ্রনাথকে বলা হয়েছিল, বানানের এই সরল নিয়মটা যেন উনি মেনে নেন। রবীন্দ্রনাথ খুব রাজি। একটা কাগজের টুকরো নিয়ে লিখেও দিলেন যে, এবার থেকে রেফের পর তিনি দ্বিত্ব বর্জন করবেন। কিন্তু এমনই মজা, বর্জন শব্দটায় উনি দুটো জ লিখে বসে আছেন।

এতক্ষণে নন্তুবাবু মুখ খুললেন আবার : দ্বিত্ব বর্জন? তাহলে 'উদ্ধৃতি' শব্দে দ-এ ধ-এ জুড়বার দরকার কী? উধৃতি লিখলেই হবে না?

ফের বাজে বকছিস? উদ্ধৃতির মধ্যে রেফ পেলি কোথায়? ঋ-কার আর রেফ কি এক হলো? একটা স্বর, একটা ব্যঞ্জন। একটা আছে পরে, একটা আছে আগে। এর মধ্যে মিলটা পেলি কোথায়?

ও, আচ্ছা। তাহলে—তাহলে—আচ্ছা, ঊর্ধ্ব? এখানে তো রেফ আছে? আগেই তো আছে?

আছে বলেই তো এখানে দ-এ ধ-এ না জুড়লেও চলে। কেবল ধ-তেই তো কাজ চলে যাচ্ছে।

চলছে কোথায়? ওই যে তার পরে একটা ব? ধ আর ব, দুটো ব্যঞ্জন হলো না? হলো না দ্বিত্ব?

এতক্ষণে এই বুঝলি তুই? এখানে দ্বিত্ব মানে হলো একই ব্যঞ্জনকে দুবার লেখা। ধ আর ব তো আলাদা দুটো ব্যাপার!

নন্তু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : তবে যে বললে একজনের ঘাড়ে একটাই মাথা? এখানে তো ব-এর ঘাড়ে চেপেছে ধ আর র!

সে তো হতেই পারে কখনো কখনো। ব্রহ্মার কটা মাথা ছিল বল্, চারটে নয়? কার্তিকের? রাবণের? সব কিছুর জন্যেই তৈরি থাকা চাই, বুঝলি?

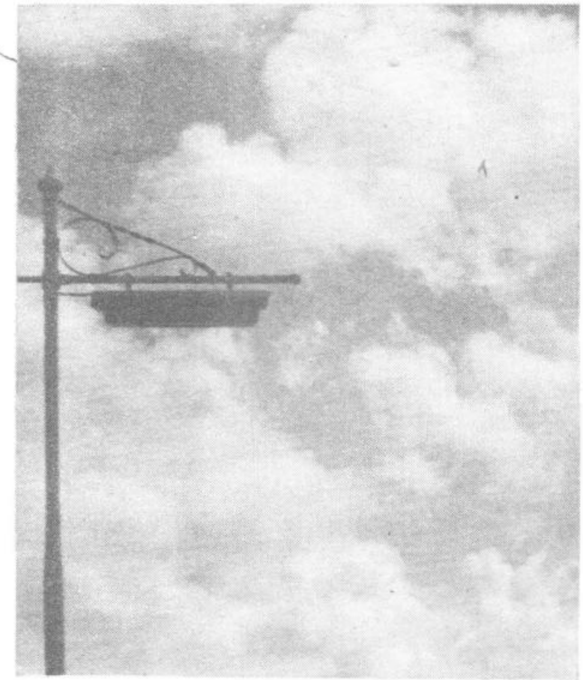

মাসটা আষাঢ়

আকাশের মুখটা যেমন মাঝে-মাঝে থম্‌থম্‌ করে উঠছে বৃষ্টিভরা কালো মেঘের ভারে, তেমনই তোমাদের অনেকেরই মুখ থম্‌থম্‌ করে উঠছে স্কুল খুলে যাওয়ার সময় হয়ে এল বলে। এর ওপর অনেকের আছে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার চাপ। তবে অনেকের ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা হয়তো একটু উলটো, অনেকেই স্কুল খোলার প্রতীক্ষায় রয়েছে, স্কুল খোলা থাকলে কতই না মজা।

এদিকে আকাশের মেঘে চারিদিক অন্ধকার হয়ে এলে কী হবে—দিন এখনও বড়ই আছে। ২২শে জুন তারিখে উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন হবে আর রাতটা হবে সবচেয়ে ছোট। মেঘের আড়ালে মুখ ঢেকে থাকলেও সূর্যদেব রোজ উঠে পড়েন ভোর ৪টে বেজে ৫৪ মিনিট ১৩ সেকেন্ডে আর অস্ত যান বিকেল ৬টা বেজে ১৯ মিনিট ১৭ সেকেন্ডে। দীর্ঘদিন গরমের পর মেঘ বৃষ্টি আর তার সঙ্গে মাটির সোঁদা-সোঁদা গন্ধ ভালই লাগে—ভালই লাগে নতুন বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজতে আর খিচুড়ি, গরম-গরম মাছ-ভাজা আর পাঁপড়-ভাজা খেতে। এখন আমড়ার অম্বলের কচি আমড়াগুলো মুখে দিয়ে চিবোতে না চিবোতেই মাখনের মতো গলে যায়। এই সময় অনেক রকমের শাকপাতা বাজারে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে হিঞ্চে, কলমি আর রাঙা নটের নাম করা যেতে পারে। রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো জামওয়ালার কাছ থেকে কুড়ি নয়ায় দশটা জাম কিনে নুন মাখিয়ে খেতেও মন্দ লাগে না। আর ভালো লাগে কামরাঙা আর বিলিতী আমড়া খেতে।

রাত্তিরে যদি আকাশে মেঘ না থাকে, তাহলে আকাশের দিকে তাকালে দেখতে পাবে তারার অবস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আকাশের পুব দিক ঘেঁষে দেখা দিয়েছে ছায়াপথ। তার নীচের দিকে আছে ধনুরাশি। ধনুরাশির মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে দুটি নক্ষত্র : উত্তর আষাঢ়া আর পূর্ব আষাঢ়া। পশ্চিম আকাশ থেকে ছায়াপথ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে, আর মিথুনরাশির অর্ধেকটাও দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে।

গাছ-গাছালির ধুলোমাখা পাতাগুলো নতুন বৃষ্টির জলে স্নান করে ধুয়ে মুছে এখন একেবারে ফিটফাট। যেখানেই মাটির চিহ্ন আছে, সেখানেই সবুজের ছোঁয়া, এমন কী ছাতের কোণে পড়ে থাকা মাটিতেও দু-একটা ঘাস গজিয়ে গেছে। বর্ষায় সবচেয়ে বেশী আনন্দ যেন কদম গাছের আর কামিনী গাছের। ডালে ডালে ফুল ফুটিয়েই তারা নিশ্চিন্ত নয়, পথে পথেও ছড়িয়ে রাখে বর্ষামঙ্গলের রেণুভরা আলপনা।

দিদিমণি

ডোডো তাতাই

লেখা | তারাপদ রায়
রেখা | কৃত্তিবাস রায়

গুরুসদয় রোডে বিজ্ঞানের মেলায় গিয়ে ডোডোবাবু-তাতাইবাবু দুজনেরই চোখ চড়কগাছ। দরজার সামনে দাঁড়াতেই বিনা বাক্যব্যয়ে দরজা নিজে-নিজে খুলে যাচ্ছে, কলের নীচে হাত পাতলেই কলকল করে জল আসছে, যন্ত্রে পেঁয়াজের খোসা ছাড়াচ্ছে, জল থেকে আলো তৈরি হচ্ছে, ফলের রস মেসিনে বেরোচ্ছে, এরকম কত কী। কান্ড-কারখানা দেখে দুজনেই চমৎকৃত ও উত্তেজিত। বাড়ি ফিরে কেবল গবেষণা চলছে কী যন্ত্র বানানো যায়।

ডোডোবাবু প্রস্তাব দিলেন, "একটা কল হোক, যেটা টেলিফোনের মত, কিন্তু তাতে যে কথা বলবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে দেখাও যাবে।" তাতাইবাবু একবাক্যে নাকচ করে দিলেন, "এ আর নতুন কী, এ তো আছেই। বরং এমন একটা পেন বানানো যাক যে-কলম নিজে-নিজে লিখবে।" ডোডোবাবু বললেন, "নিজে-নিজে কী লিখবে?" তাতাইবাবু জবাব না দিয়ে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে লাগলেন, সেখানে একটা বিজ্ঞাপনে তাঁর চোখ আটকে গেল। ডোডোবাবু দেখলেন সেটা একটা দই তৈরির যন্ত্রের বিজ্ঞাপন, দেখে ডোডোবাবু প্রশ্ন করলেন, "এই জিনিস বানাবেন?" "আরে, না না, এই আইডিয়া থেকে নতুন জিনিস বানাব।" ডোডোবাবু বললেন, "কী রকম?" তাতাইবাবু বললেন, "দুধের কল বানাব।" ডোডোবাবু সন্দেহ প্রকাশ করলেন, "দুধের কল যেন আগেও শুনেছি।" তাতাইবাবু রেগে উঠলেন, "আগে শুনেছেন, না কচু! এটা একদম নতুন, গরুর মত দেখতে হবে যন্ত্রটা, তার সামনে খড়-ভুষি-জল দেওয়া হবে, ভিতরে মেশিনে সবকিছু মিলেমিশে দুধ হয়ে যাবে, সেই দুধ তারপর নল দিয়ে বাইরে বেরোবে।"

সত্যিই দুধের কলে খড়ভুষি থেকে দুধ হবে কিনা, কে জানে, কিন্তু তাতাইবাবু এর মধ্যে যন্ত্রের নকশা করে ফেলেছেন, সবাই দেখে মতামত দিক।

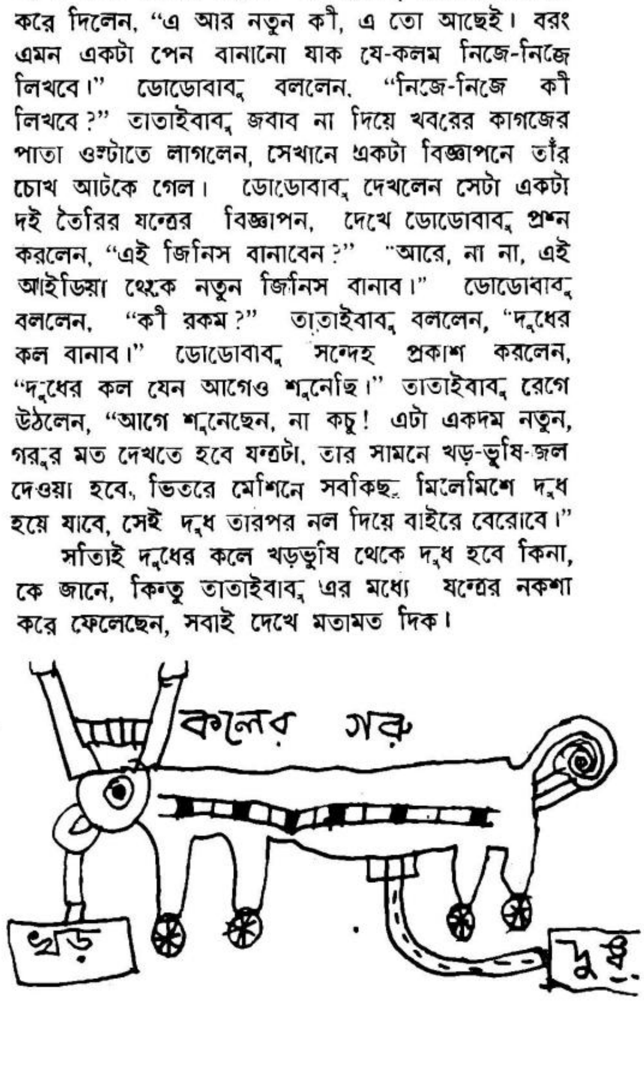

ঝলমলে নগরী

১লা জুন ১৯৭৬

নিজেকে যুদ্ধ ও জ্ঞানের দেবী বলে প্রচার ক'রে মহাধনবতী, রূপসী এবং নির্মম এথিনা সিওসী তার প্রজাদের ধোঁকা দিত। বেতাল সাবধান করে দেয় এই ধোঁকাবাজি বেশীদিন চলবে না। এথিনা বেতালকে বন্দী করে। চলমান অশরীরীর সামনে দুটো পথ—এথিনার সঙ্গে হাত মেলানো, নয়তো মৃত্যু।

অন্যায়ের মুখোমুখি ন্যায়ের এই হৃদয়গ্রাহী কাহিনী আসছে ইন্দ্রজাল কমিক্‌সের ১লা জুন ১৯৭৬ সংখ্যায়।

সাগরতটের দস্যু

১৫ জুন ১৯৭৬

১৫০০ যাত্রী বোঝাই এক প্রমোদতরণীকে লুট করলো এক ডাকাত দল, অথচ কোন সূত্র রইলো না। যাত্রীর ছদ্মবেশে বেতাল এগিয়ে এলো ওদের ধরতে। জাহাজ তল্লাশী করে কিছুই বেরুলো না, অথচ বেতাল নিজেই বন্দী হয়ে গেল নিজের কেবিনে।

একা হয়েও অজেয় যে বেতাল—সে এখন কি করবে?

এর উত্তর রঙে ও ছবিতে ভরা এক রহস্যঘন কাহিনী আসছে ইন্দ্রজাল কমিক্‌সের ১৫ই জুন ১৯৭৬ সংখ্যায়।

ইন্দ্রজাল কমিকস

টাইম্‌স অফ্‌ ইণ্ডিয়া প্রকাশন

সার্কুলেশন ম্যানেজার,
"ইন্দ্রজাল কমিকস" টাইম্‌স্ অফ্ ইণ্ডিয়া, বম্বে ৪০০ ০০১.

আমি বাংলা/হিন্দি/ইংরেজি
"ইন্দ্রজাল কমিক্‌সের" গ্রাহক হতে চাই।
বার্ষিক চাঁদা ২৬ টাকা পাঠালাম।

নাম --

ঠিকানা --

চাঁদার টাকা মনিঅর্ডার/চেক্/ড্রাফ্টে পাঠাবেন।

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানে এবারে জবর পাঞ্জা

স্ট্রাইকার

আধ লাখ দর্শকে ভর্তি ইডেনে মিলন মিত্তিরও হাজির ছিল। ইস্টবেঙ্গল-ক্রুকটাউনের লড়াই। মিলন বসে ছিল সেই টঙে, কাঠের মাচায়। ফস্ করে ঠোঁটে আসছে, মিলন কি মোহনবাগানের মাচা-সাপোর্টার? এরকম উটকো ভাবনার হেতু, ওর নামের মধ্যে 'ম'-এর কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি রয়েছে। তবে বলি, মিলনের ব্যাপারটা আরও বড়-কিছু। সেদিন তার ইডেনে ঢোকার একটাই উদ্দেশ্য। দেখতে চেয়েছিল, ক্রুক-টাউনের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল কেমন লড়ে।

খেলার শেষে মুখোমুখি হলাম মোহনবাগানের মাচা-সাপোর্টার বলরাম বলের। যেন ঈশ্বর তাঁকে এই মাত্র পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, এবং আমার সামনে।

"কী বলমশাই, ভারতের সেরা টিমের কেমন খেলা দেখলেন?"

প্রায় আলজিব দেখিয়ে হাঁ করে বললেন, "দারুণ। আমার আসল কমেন্ট শুনবেন সেই জবর লড়াইয়ের শেষে।"

নিমেষে দেখি, বলরামবাবু ঘেরাও। ওঁকে কিছু ইস্টবেঙ্গল-সাপোর্টার পাকড়াও করেছে। ওদের মধ্যে দুজন ফুট কাটল, "সেদিন বলরামবাবু মাঠে আসবেন তো? হো-হো-হো।"

গত কয়েক বছর মোক্ষম খেলায় খারাপ রেজাল্ট হলেই বলমশাই খাটের তলায় গামছা পরে শুয়ে নির্জলা উপবাসে কাটিয়েছেন। এবার দেখলাম আঙটি আর মাদুলির গহনায় বলমশাইকে একেবারে গ্রহান্তরের মানুষের মত লাগছে। জটলাটা ওঁকে গত কয়েক বছরে ইস্টবেঙ্গলের রেকরডের গল্প শোনাতে-শোনাতে অনেক দূর নিয়ে গেল। উনি সায়েন্টিফিক ব্রহ্মাস্ত্র ঝাড়লেন, "হুঁ, হুঁ বাবা, এখন টেপ-রেকরডারের দৌলতে তোমাদের হাজার রেকরড নিমেষে মুছে দেওয়া যায়। আর আমাদের ১৯১১-র সময় টেপ ছিল না, সে

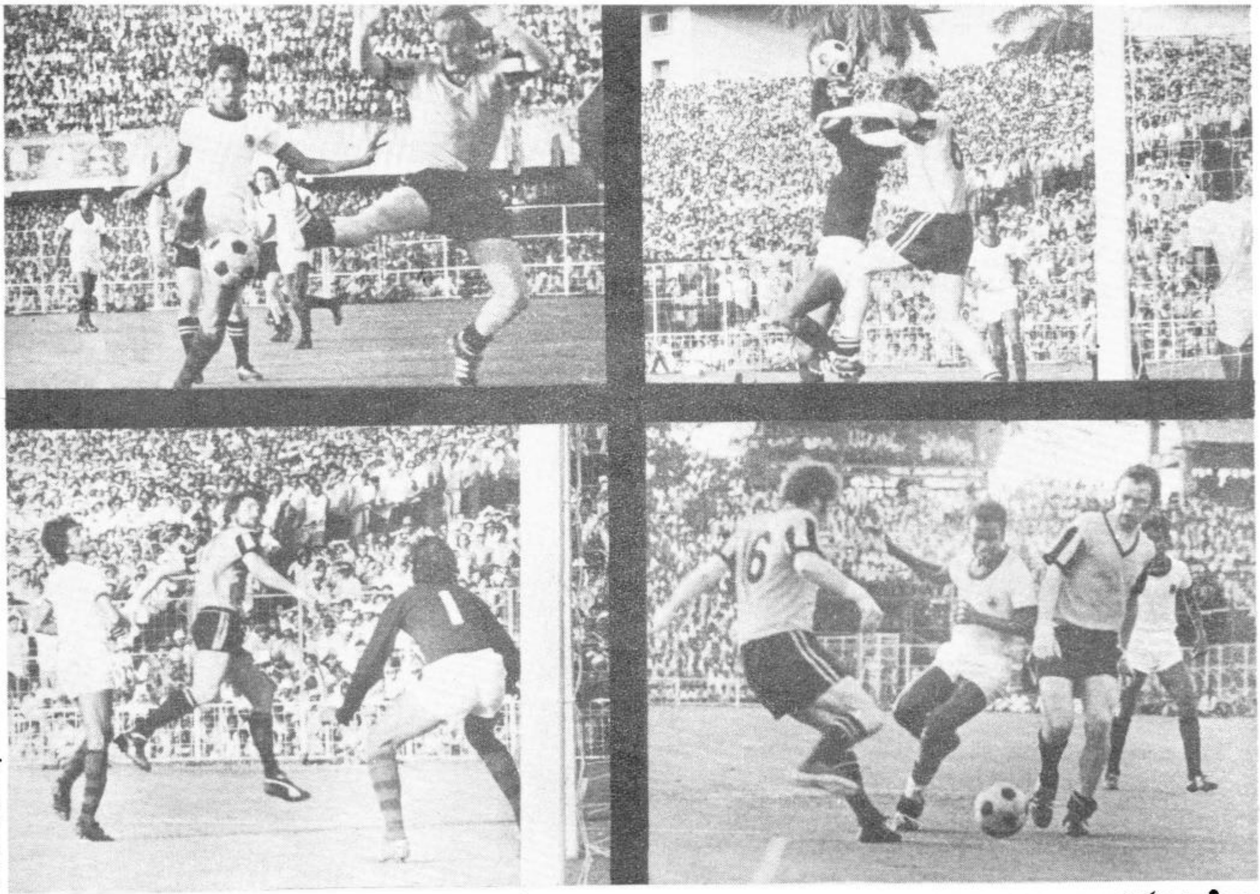

মোহনবাগান-ব্রুকটাউনের খেলা

রেকরড কে মুছবে? সে-সব করতে হলে আবার ইংরেজকে আনতে হয়, দেশ পরাধীন করতে হয়, এলাহি ব্যাপার। এই দ্যাখ্, তোদের গোলডেন জুবিলী আমরা ব্রুক-টাউন এনে সেরে দিলাম।"

অবাক কান্ড। চারপাশে মশালবাহিনী আর নেই। বল-মশাই নেতাজীর স্ট্যাচুর দিকে ফিরে খটাস করে একটা গরম স্যালুট ঠুকেই বললেন, "এবার আমাদের টিমে সামনে-পিছনে জোড়া-নেতাজীই ভরসা।" বলেই চম্পট লাগালেন বলমশাই। কিছুটা হাঁটতে-হাঁটতে ওর হেঁয়ালিটা হজম করলাম। সামনের সারিতে সুভাষ হল এক নমবর নেতাজী, আর দু নমবর, পিছনে খোদ দলনেতা গোলকীপার প্রশান্ত মিত্তির। ওরই চেনা মহলের নাম মিলন। দলের তো সে-ই নেতা।

গত কয়েক বছরে মোহনবাগান-সমর্থকদের কাছে প্রশান্ত ভাল-মন্দ দু রকম সার্টিফিকেটই পেয়েছে। তার সম্বন্ধে গ্যালারিতে কথাবার্তা হয়। অনেকে বলে, "উঁচুর বল সে বেশ রোখে। কোমর নামাতে দেরি হওয়ার জন্য খুব বেশী নীচের বল সে অনেক সময় আটকেও ফসকায়। বড় ম্যাচে গোল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বেশী তানানানা না-করলে অনেক গোল সে অনায়াসে বাঁচাতে পারত। আমরা চাই, প্রশান্ত সনৎ শেঠ হোক্, ভরদ্বাজ হোক্, তা না-পারলে অন্তত তরুণ বোস হোক্।"

সেই প্রশান্ত এবার খেলোয়াড়দের ক্লাব-ছাড়াছাড়ির সময় এক অদ্ভুত মুডে ছিল। তার খোলাখুলি কথা। "চারদিকে গুজব ছিল তরুণ বোস এবার মোহনবাগানে আসবে। প্রথমে আমিও কিছুটা দোনোমনা হয়েছিলাম। হঠাৎ মন শক্ত করে বাঁধলাম। আমার চিরকালই লাখ কথার এক কথা, প্রতি মরসুমে ক্লাব পাল্টানো আমার ধাতে সয় না। দেখি না, তরুণ আসুক, ক্লাব আমাকে সাফ জানাক, প্রশান্ত তোমায় আমরা রাখতে পারব না। তবেই হেস্তনেস্ত করব।"

সেই প্রশান্ত ওরফে মিলন মোহনবাগান টিমের ক্যাপ্টেন। মোহনবাগানের গোল খাওয়া-না-খাওয়ার শেষ দুর্গ। আদিতে ওদের বাড়ি সেই পূর্ববঙ্গে। মনের দিক থেকে দারুণ মজবুত। "খেলা খেলাই, সেখানে বাঙাল-ঘটি প্রসঙ্গের কী আছে। মোহনবাগান আমায় অধিনায়ক করেছে, আমি সেই সম্মানকে জান দিয়ে আগলে রাখব।"

প্রশান্ত আরও বলে, "ক্লাবের সেই সম্মান খেলার দিক থেকে প্রচণ্ডভাবে ঘা খেয়েছিল গত বছর শীল্ড ফাইনালে।" টিমের পাঁচ গোল খাওয়ার করুণ অবস্থার মধ্যে চারটে গোল সে সাইড-লাইনের ধারে বসে চাক্ষুষ করেছে। সে যখন মাঠে নামে, তখন খেলার খেলা চলছে। একটা গোল তাকেও হজম করতে হয়। প্রশান্তর কৈফিয়ত, "মোহনবাগানের ওই খেলায় এরকমভাবে হারার কোনও কারণ ছিল না। ওই খেলাটার আগে টিমকে ডায়মন্ডহারবারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে কাদামাঠে প্র্যাকটিস করে সকলেই পা ভারী হয়ে কাহিল হয়ে পড়েছিল। তারপর পা-মুড়ে মিনিবাসে সোজা সেখান থেকে কলকাতায়। গোদের উপর বিষফোঁড়া। মাঠে খেলার লাগাম ধরার আগেই দুম্‌দুম্ করে গোল খেয়ে সব শেষ।"

প্রশান্তর কথায়, "এই মোহনবাগান টিম গত কয়েক বছরে ব্যাড রেজাল্ট করার একমাত্র কারণ, টিম বলতে যা বোঝায়, ছোট-বড় প্রায় খেলাতেই তার পরিচয় রাখেনি। টিম যে একজন কোচের দ্বারা তৈরী, তা বোঝা রীতিমত কষ্টকর ছিল। বেশী সময়ই যে যার জায়গা আঁকড়ে নিজের খেলা খেলত। দলের জন্য জান লড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা প্রায় ঘটতই না। এ-অবস্থায় কতক্ষণ আর গোলে দাঁড়িয়ে সামাল দেওয়া যায়। এতে যা হবার, বারবার তা-ই হয়েছে। আশ্চর্য লাগে, তুলনা করে দেখি, আমরা ইস্টবেঙ্গলের চেয়ে কোনওভাবেই কমজোরী ছিলাম না। শুধু টিম-স্পিরিটের অভাবে ওদের সঙ্গে খেলায় আমাদের সব কিছু গুলিয়ে গেছে।"

এবার সেই হরদম-গুলিয়ে-যাওয়া টিমের ক্যাপ্টেন ইডেনে কাঠের বাক্সয় বসে ইস্টবেঙ্গল টিমকে দেখল অন্যভাবে, বলল,

"ওদের ডিফেন্সকে তেমন পোক্ত লাগল না। অশোকলালকে না নামালে, কুক টাউনের বিপক্ষে যা হয়েছে, অন্য ম্যাচেও ওদের সমূহ বিপদ ঘটবে। ওদের ডিফেন্সের মাঝখানটা বড় পলকা। বন্যার জলের মত বিপক্ষের আক্রমণ হুড়হুড় করে গোলে পৌঁছচ্ছে, সুধীর আর গৌতমই ওদের মূল ভরসা।"

কিন্তু যাদের সঙ্গে প্রশান্তর আসল যুদ্ধ, সেই ইস্টবেঙ্গল ফরোয়ার্ড লাইন কেমন খেলবে?

"সুরজিত এবার ওদের আক্রমণের মূল খুঁটি। শুভঙ্করের মধ্যে গতি আছে। ও ভালই বল বশে রাখতে পারে। শ্যাম বয়সের ভারে বেশ কাবু। রঞ্জিতও যথেষ্ট সুযোগ-সন্ধানী, তবু ওদেরকে চুপ করিয়ে দেওয়ার মত ডিফেন্সও আমাদের রয়েছে। এবার আমাদের লিংকম্যান কোনও প্রবলেম নয়, আমাদের ডিফেন্সেও দস্তুরমত রুখনেওয়ালা প্লেয়ার রয়েছে। তবু এখনও মেরামত দরকার। সুব্রত ভট্টাচার্য যদি বাহারী খেলা ছেড়ে সিরিয়াস হয়, তবে ওর জুড়ি পাওয়া ভার। প্রদীপ চৌধুরীও বেশ মজবুত। শুধু ওর ট্যাকলিং ও বল-কনট্রোলের কাজটা আরও জোরদার হওয়া উচিত। ওদের পাশে দুই দিলীপ ঠাণ্ডা মাথায় খেললে আমাদের গোলের ঘাঁটিতে কে চড়াও হতে পারবে?"

টিমে ক্যাপ্টেন হওয়ার বিশেষ ঝক্কি কিছু আছে কি?

"না, তেমন কিছু নেই। তবে এবার ভরপুর চ্যালেঞ্জের মরশুম। মাঠে দলের ফাঁক-ফোকর বোজাতে গোল-লাইনে দাঁড়িয়ে সব সময়েই ডিফেন্সকে হুঁশিয়ার করি; এবারও করব, তবে এবারের ভাবনা আর-একটু বাড়তি। কাঁধে ক্যাপ্টেন হওয়ার দায়িত্ব। আরও কথা, এবার আমাদের টিমে দস্তুরমত ওজনদার প্লেয়ার আছে। এক কথায়—আমরা মরীয়া হয়ে লড়ব। কোচ প্রদীপদা আমাদের মনের আসল ভয় কাটিয়ে দিয়েছে। শুধু এখন ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষা। গত চার বছর মোহনবাগানে খেলছি, কিন্তু এমন চমৎকার আবহাওয়া আর-কখনও পাইনি। মাসখানেকের প্র্যাকটিসেই প্রদীপদা আমাদের মনের মধ্যের সেই হেরো-ভূতটাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা এবার প্রস্তুত।"

সত্যিই প্রশান্ত প্রস্তুত, প্র্যাকটিসের ধকলে ওর চোখের কোল ঘিরে যেন গ্রহণ লাগার ছায়া। শরীরটাও আগের চেয়ে অনেক পেটানো। যেন ইস্পাতের চাদর। গোলের দোরগোড়ায় ওর চলাফেরায় বেশ চটপটে ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে।

সেদিন কুক টাউনের খেলার শেষে গৌতম সরকার বাড়িতে ফিরলে ওর বোন উমা বলে, "মেজদা, তোরা ওদের হারাতে পারলি না?" বাড়ি ফেরার পথেই গৌতমের মনে হয়েছিল, উমা ঠিক এই প্রশ্নই করবে। বাড়িতে উমাই তার মস্ত সমালোচক। আবার, সবচেয়ে বেশী প্রেরণাও তাকে উমাই জোগায়।

গৌতমকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, মোহনবাগানের তরফে তোমাকে টানবার চেষ্টা যদি জোরদার হত, অথবা তোমার উপর এবার যদি ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব না থাকত, তাহলে কি তুমি জার্সি চেঞ্জ করতে?"

গৌতম তার মিশুকে হাসিটি ঠোঁটে এনে জবাব দিল, "গত কয়েক বছরে ইস্টবেঙ্গলই আমায় সবার কাছে মেলে ধরেছে। ওই জার্সি'র ইজ্জত আমার কাছে আলাদা। জার্সিটা পরলেই যেন মনটা টগবগ করে ওঠে। এতে মাঠে শরীর অথবা মনের কোনওরকম অস্থিরতা টের পাই না। আমাদের টিমের বড় মূলধন টিম-স্পিরিট।"

গৌতমের ডাকাবুকো মনে একফোঁটা দুর্বলতা নেই। শান-দেওয়া কথায় নিজের যুক্তির ঝাঁপি খুলল। এবারে ময়দানের ফুটবল-লড়াইটা আর তিনমুখো নয়। আমরা লড়ব প্রদীপদার মোহনবাগান টিমের বিরুদ্ধে। এ-লড়াইয়ে মহমেডান খুব-একটা নাক গলাতে পারবে না।"

এই সব জেদাজেদির কথা হতেই গৌতম হঠাৎ খপ করে জ্বলে উঠছে। লিন্ডসে স্ট্রীটের মুখে সে রাস্তা পেরোচ্ছিল। বাঁ হাতের তালুতে ঘুঁষি মেরে বলল, "ভৌমিক, হাবিব,

ইস্ট বেঙ্গল-কুকটাউনের খেলা

আকবর বল নিয়ে আমাদের গোল এরিয়ায় ঢুকবে আর গৌতম সরকার তা ফ্যালফ্যাল করে দইয়ে-দুধে হাত-পা ডুবিয়ে দেখবে? না, সে-বান্দা আমি নই। গত ক'বছরে যেমন লড়েছি, এবারও তেমনিভাবেই লড়ব। টিম ওরা যাই করুক না, আমরাও ছেড়ে কথা কইব না।"

গৌতম যখন রেগে যায়, তখন একটা প্রসঙ্গ বারবার ঘুরে আসে। তার রাগটা ঠিক মোহনবাগান টিমের উপর নয়। তার ক্ষোভের ঝকঝকে ফলাটা বিশেষ একজনের দিকেই যেন সদা-উদ্যত।

"ক্লুকটাউন-মোহনবাগানের খেলা দেখেছিলে?"

গৌতম বলল, "কী দরকার? ওসবের বড় একটা প্রয়োজন বুঝি না। ওদের সঙ্গে খেলার দিনই খেলতে-খেলতে সব বুঝে নেব।"

ক্লুক টাউন-ইস্টবেঙ্গলের খেলা থেকে গৌতম নিজের টিমের হিসাব কষল এইভাবে। "আমাদের টিম সব বিভাগেই সেরা। মূল ভরসা ডিফেনসে সুধীর, আর সামনের সারিতে সুরজিত। এই দুজনের জুড়ি কলকাতা-মাঠে এখন নেই। উপরন্তু টিমে সুধীর আমার অভিভাবক। ও থাকায় বিরাট ভরসা। সব কাজ ওর পরামর্শমতই করি।"

সুরজিত সম্বন্ধে ভেঙ্কটেশের কথাটা গৌতমের কানে বারবার বাজে, "সুরজিত হাম্‌সে বড়া প্লেয়ার।" গৌতম বলল, "ওর সঙ্গে শ্যাম, শুভঙ্কর, রঞ্জিত, প্রদীপ তাল দিতে পারলেই বাস, ইস্টবেঙ্গল ফরোয়ারড-লাইনকে তখন কে আটকাবে?"

পিণ্টুর জন্য গৌতমের এখনও মন কেমন করে। ওর পায়ের-কাজে গৌতম মুগ্ধ। কিন্তু ওর জায়গায় রতন কতটা মানানসই হয়, সেটাই গৌতমের ভাবনা। "রতন তাড়াতাড়ি খেলা ধরতে পারলেই আমরাও টিম হিসাবে ময়দান মাতিয়ে তুলব।" এর চেয়েও বড় কথা—মাঠের বাইরেও ইস্টবেঙ্গল-প্লেয়ারদের ছোট বড় সব কাজে বোঝাপড়াটাই গৌতমের সবচেয়ে বড় মূলধন।

প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা উঠতেই গৌতম ঝপ করে বলে ফেলেছে, "মোহনবাগ্যানের ফরোয়ারড লাইন ভয়ংকর, কিন্তু ডিফেনস ততটা মজবুত নয়।" 'ভয়ঙ্কর' কথাটি মোহনবাগান ফরোয়ার্ড লাইন সম্বন্ধে কি ঠিক খাটে, এই প্রশ্নে গৌতম একটু বিচলিত হল। বলল, "না, আমি ওদের অফেনস ডিফেনস দুই বিভাগের মধ্যে শক্তির ফারাক বোঝাতে কথাটা ব্যবহার করেছি।"

দু পক্ষের খেলার ছকের কথা উঠল। গৌতমের বিশ্বাস, অশোকলাল ব্যানার্জি ব্যাকে দাঁড়ালে ইস্টবেঙ্গল ফরোয়ার্ড লাইনের ফাটলগুলো অনেকটা মেরামত হয়ে যাবে। আরও কটা প্রশ্ন নিয়ে টাগ-অফ-ওয়ার হল।

সুভাষকে যদি মাঝখানে রেখে ওরা আক্রমণ চালায়?

গৌতম বলল, "ঝামেলা বাড়বে। তবে ওকে ঠাণ্ডা রাখতে আমাদের টিমেও প্লেয়ার রয়েছে।"

যদি হাবিবকে নামিয়ে খেলানো হয়?

"ওর জন্যও প্লেয়ার মোতায়েন হবে। তবে এতে ওদের অ্যাটাকের ঝাঁজেও বেশ খানিকটা হেরফের হতে পারে। তবে যে যত কসরতই করুক, আমরা বিজয়ীর মত লড়ব।"

হবে, হতে পারে—এই নিয়ে সমর্থকরা ময়দান গুলজার করছে। অবাক করল দুই অধিনায়ক তাদের অমায়িক ব্যবহারে। আশ্চর্য, ওরা মাঠে খেলে, আর গ্যালারির লোক তা নিয়ে মাথা ফাটায়। মোহনবাগান তাঁবুতে দুই অধিনায়ককে এক দফা পাঞ্জা লড়তে অনুরোধ করেছে আমাদের ফটোগ্রাফার। তাজ্জব, ওরা হাসিমুখে এক কথাতেই রাজী।

গ্যালারি থেকে

দাবার ছকে দিব্যেন্দু এখন এক নম্বর। না, সে রাজ্যের সেরা দাবাড়ু নয়। চ্যাম্পিয়নের নাম তো আনন্দ ঘোষ। তবু জনপ্রিয়তায় দিব্যেন্দু বড়ুয়া পয়লা নম্বর। একই ঘরে আলাদা টেবিলে আনন্দ ঘোষ আর দিব্যেন্দু বড়ুয়ার খেলা পড়ুক, সব তর্কের সমাধান হয়ে যায়। অবিশ্বাস্য, লোকে আনন্দকে ছেড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দিব্যেন্দুর দাবার ছকে। ওই তো পুঁচকে চেহারার দিব্যেন্দু। খেলার চেয়ারে বসলে তাকে খুঁজে পাওয়াই শক্ত। বলতে গেলে চোখেই পড়ে না। শুধু তার বুদ্ধি-বোঝাই মাথাটাই যা বোর্ডের কাছাকাছি ঠাহর হয়। চারপাশে কে রয়েছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। শুধু তার কড়া নজর অপোনেন্টের চোখে। দিব্যেন্দুর মোক্ষম ম্যাজিক—প্রতিদ্বন্দ্বীর চাউনি দেখে সে টের পায় তার মন কী বলছে। এত সব চুপচাপ ভেল্কি নিয়ে দিব্যেন্দু এখন জুনিয়ারে সারা ভারতে ছয় নম্বর এবং বাংলায় পাঁচ নম্বর দাবাড়ু। শুধু জুনিয়ারেই নয়, বড়দের প্রতিযোগিতাতেও সে এখন বেশ ডাকসাইটে।

বছরখানেক আগে একটি প্রতিযোগিতায় দিব্যেন্দুকে নিয়ে এক মজার কাণ্ড ঘটেছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এক অধ্যাপক। তিনি সেদিন একটু দেরি করে খেলতে এসেছিলেন। এসেই উদ্যোক্তাদের বলেন, কী মশাই, অপোনেন্ট কি আসেননি? সঙ্গে-সঙ্গে উনি জবাব পেলেন, ওই তো দিব্যেন্দু বড়ুয়া আপনার অপোনেন্ট। অধ্যাপক তো থ! "এই বাচ্চাটি খেলবে আমার সঙ্গে?" খেলতে বসে অধ্যাপক টের পেয়েছেন, বয়স দিয়ে দিব্যেন্দুর দাবার-বুদ্ধির ওজন সম্ভব নয়।

মাত্র সাড়ে পাঁচ বছর বয়সেই ওর মগজে দাবার ছক পাতা হয়েছে। তখনই বাবা-দাদা-মাস্টারমশাই, কেউই তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতেন না। বাড়িতে নানা জনের খেলা দেখে সে খেলা শিখেছে। হেয়ার স্কুলের ক্লাস ফাইভের ফার্স্ট বয় দিব্যেন্দুর মনে দাবার ছক এইভাবেই জায়গা পায়। ঠিক কবে কার কাছে শিখেছে সেটা সে মনে করতে পারে না।

এই একরত্তি দাবাড়ুর খেলার জবর মজা—চাল দেবার সময় ও কখনও দ্বিধায় ভোগে না। বয়সের গুণে বেশ ছটফটে। প্রতিদ্বন্দ্বী তেমন কমজোরি হলে সরাসরি সে আক্রমণাত্মক খেলে। যদি ঝানু প্রতিদ্বন্দ্বী হয় তবে পাকা যুদ্ধবাজের মত গুটিগুটি এগোয়, সাঁড়াশি-আক্রমণে বিপক্ষকে বিব্রত করতে।

বই দেখে খেলা শেখার ঝোঁক আদৌ নেই। নিজের খেলা নিজেই সে তৈরি করে। তিন বছর আগে প্রথমবার বড় প্রতিযোগিতায় নামার আগে সে খুব কেঁদেছিল। তার কারণ, সব দাবা কম্পিটিশনই প্রায় সন্ধের শুরু হয়। রাত সাড়ে আটটার পরে তার খেলতে একটুও ভাল লাগে না, ঢুলুনি আসে। বয়সী দাবাড়ুকে হারালে ওর দারুণ আনন্দ। অনেকেই ভাবে দিব্যেন্দু নাকি 'প্রডিজি'। দাবায় দিব্যেন্দুর জন্মগত প্রতিভা রয়েছে। ভবিষ্যতে সে আরও বড় চমক দেবে।

ছড়াছড়ি

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

এক ছিলো কাক আর তার তিন কাকিনী
কেঁদে বলে আমি কেন পাউডার মাখিনি ?
ডাকে যে বিকট সুরে
ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে
কোটোটা কেন আমি মগডালে রাখিনি !

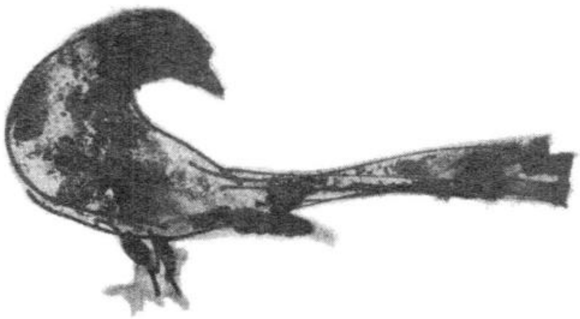

সাহারা গরম, ঠান্ডা শিলং
কাশ্মীরে নদী বইছে ঝিলম—
কানাডার মমি, মিশরের গম ?
ধুড়ি, ভুল হলো, নম্বর কম !

বোম্বে গেলুম দেখতে পেলুম
পক্ষীরাজ ঘোড়ার ডিম।
না গো দাদা, কোথায় ঘোড়া ?
ডিমের ভেতর দাঁড়িয়ে জোড়া
খোঁড়া গাধা, মাথায় শিং !

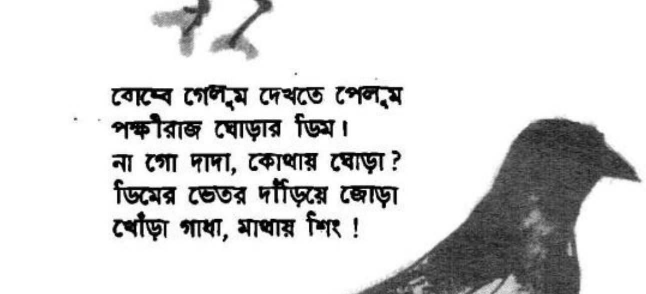

সর্ষে পড়া

সুনীল বসু

হিংকিড়ি ফিংকিড়ি ছিংকিড়ি ছা
ভূত ব্যাটা দৌড়ে পালিয়ে যা
হিংকিড়ি ঢিংকিড়ি কিড়িকিড়ি তা
কটমট মটমট হাড়গোড় খা
বেলপাতা জামপাতা আমপাতা ফুঃ
লাফ্ খেয়ে ঝাঁপ খেয়ে বল্ ব্যাটা উঃ
তস্কর মস্কর আস্কারা পেয়ে
যা চলে ড্যাং ড্যাং
ল্যাং ল্যাং খেয়ে
হিং টিং টিং টিং হাঁউমাঁউ ভূত
যা চলে যমালয়ে যমরাজ পুত
হিংকিড়ি ঝিংকিড়ি কিংকিড়ি যাঃ
বল ব্যাটা ঘোর ঠ্যাটা খুব ল্যাঠা আঃ
দৌড়ে গোড়ে পালিয়ে যাঃ
হিংকিড়ি ফিংকিড়ি ছিংকিড়ি ছাঃ !

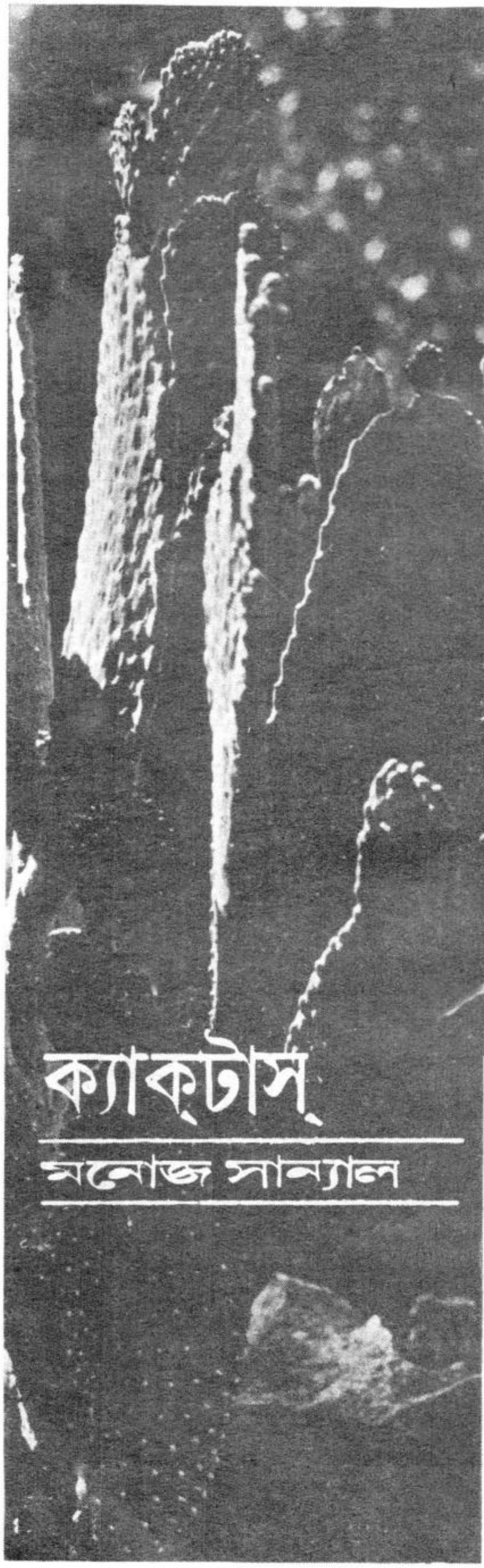

ক্যাকটাস্

মনোজ সান্যাল

নামটা কী ক্যাটকেটে আর বিদ্ঘুটে! বরং টফি ললিপপ গোছের একটা কিছু হলেও বোঝা যেত আর জিভে জলও এসে পড়ত। তবে এটা কী? এটা নাকি এক রকমের গাছের নাম!

হ্যাঁ, তা-ই, আর দেখেওছ তোমরা সবাই। তবে কী জানো, ক্যাকটাসকে দেখে গাছ বলে চেনাই যায় না। সত্যি ভারী অদ্ভুত এই গাছ! জল লাগে না, সার দিতে হয় না—অথচ দিব্যি সবুজ সতেজ হয়ে বেড়ে ওঠে। গুঁড়ি নেই, ফুরফুরে হাওয়ায় পাতলা পাতার নাচন নেই—গাছের কোন আদলই নেই! থাকবে কোত্থেকে? আসলে যেগুলোকে আমরা পাতা ভাবি, তা ওদের ডালপালা। দেখতে মোটাসোটা, একটার পর একটা, তার ওপর আর একটা—এইভাবে গায়ে গায়ে লেগে মাথা উঁচিয়ে ওঠে। ডালগুলো আবার নানান ধরনের—কোনটা গোল, কোনটা লম্বা লাঠির মতো, কোনটা খাঁজকাটা, কোনটা বা কোঁকড়ানো গোল আনারস বা তরমুজের মতো। তবে সবই রসে ভরা। কারও কাঁটা আছে, কারও বা নেই। কাঁটাগুলো ওদের ঢাল-তরোয়াল, গরু-ছাগলের মুখ থেকে বাঁচার জন্যে গায়ে গজিয়ে রাখে।

বেশির ভাগ ক্যাকটাসের কোন পাতা নেই। ডালপালাই ওদের পাতার কাজ করে। শুকনো বালি, পাথুরে মাটি আর সূয্যিমামার আলো থেকে ওরা জল আর খাবার যোগাড় করে। নিজেরা রোজ খায় আর অসময়ের জন্যে কিছু জমিয়ে রাখে। এদের ডালের রস ভারী মিষ্টি। অনেক দেশে এই রস খেয়ে মানুষ তেষ্টা দূর করে। মেক্সিকোর বাজারে তো দিব্যি আলু-পটলের মতো ক্যাকটাস বিক্রি হয়। রান্না করে লোকে মজাসে খায়।

ক্যাকটাস মরুভূমির গাছ। আদি নিবাস আমেরিকায়। এখন এরা পৃথিবীর সব গরম দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে।

বহু জাতের ক্যাকটাস আছে। আমাদের দেশেও প্রচুর জন্মায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে চেনা আমাদের কাঁটা-ওয়ালা ফণিমনসা। মিহিজাম-জামতারা-মধুপুর লাইনে যেতে নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছ। দুধারে দেহাতী বাড়ির বেড়া হিসেবে লাল মাটির বুকে অজস্র ফণিমনসার সারি।

নানা রকমের ক্যাকটাসের জঙ্গল দেখতে ভারী অদ্ভুত লাগে! দূর থেকে দেখলে মনে হয় সারি সারি সেপাই বল্লম উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, না হয় বিরাট রাজপ্রাসাদের উঁচুউঁচু থামের লাইন, রাজপুত্তুর ছুটছে টগবগিয়ে ঘোড়ায় চেপে, গাঁয়ের বৌ চলেছে মাথায় কলসী নিয়ে, আবার কাউকে বা মনে হয় কুমড়ো-পটাশ—মাথায় রসগোল্লার হাঁড়ি।

ভারি মজাদার এই ক্যাকটাস! কেউ বিতিকিচ্ছিরি, কেউবা ফুলে-ফুলে আলো করে থাকে। ডাইনের পাতায় যে-ক্যাকটাসের রঙিন ছবি ছাপা হয়েছে, তার জন্ম এ-দেশে নয়। কেমন সুন্দর ফুল ফুটেছে দ্যাখো। ফুলগুলো কী সুন্দর, মনোরম আর রঙবেরঙের! লাল, নীল, হলদে, বেগুনী—নানা রঙের, নানা নকশার ফুল।

আজকাল অনেকেই ক্যাকটাসের চাষ করে। বসবার ঘরে টবে নানা-রকমের ক্যাকটাস রাখে। মজার খেয়াল একটা! তোমরাও তোমাদের পড়ার ঘর সাজাতে পার। নকশাকাটা রঙিন টবে ছোট-ছোট ডাল কেটে বেলে মাটিতে লাগিয়ে দাও। দেখবে দিব্যি গজিয়ে উঠবে ডালপালা মেলে। কেমন সুন্দর! তাই না?

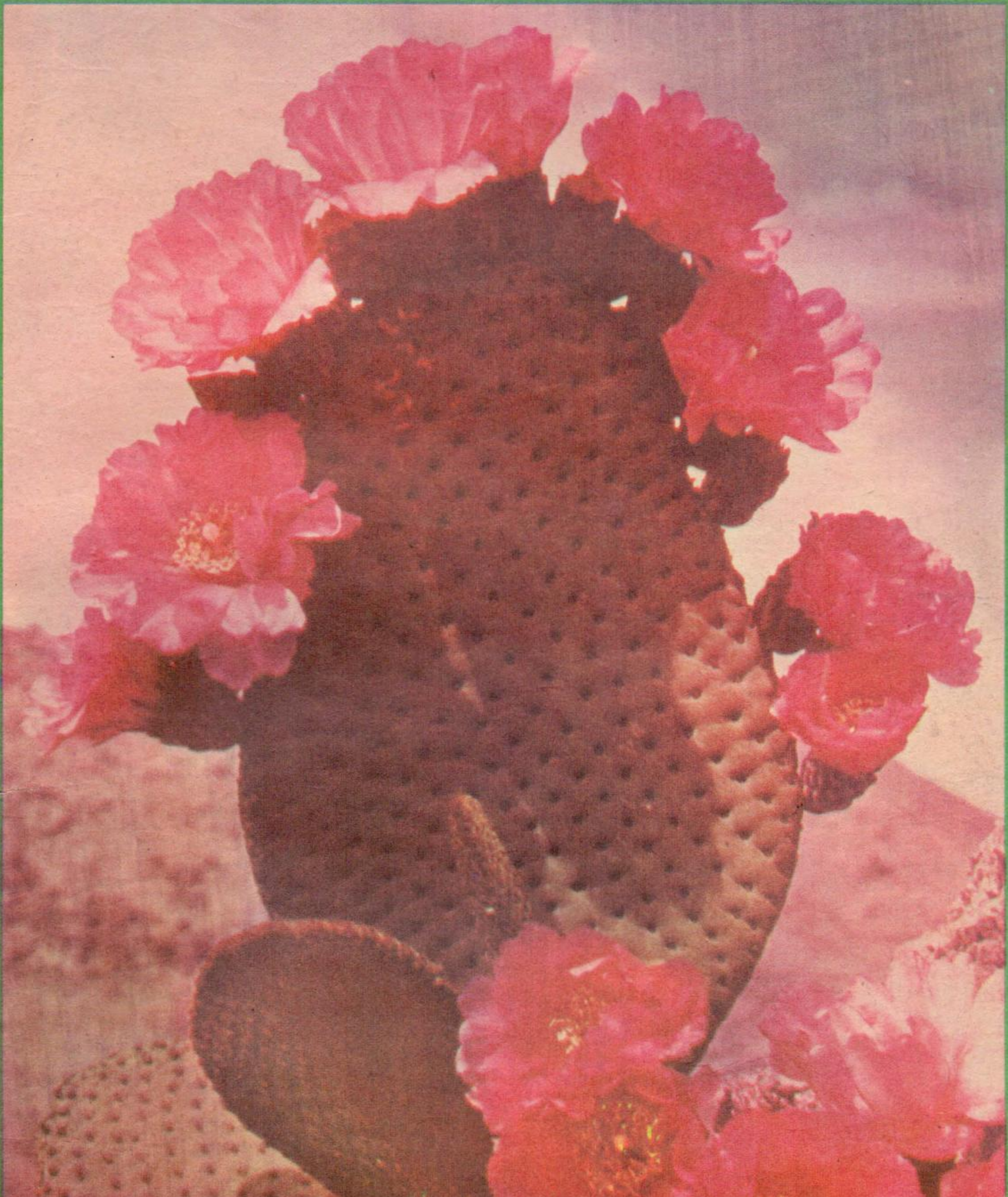

কল্লোল মজুমদার

বরফের উপরে দৌড়

১৩০৫০ ফিট উঁচুতে বরফে ঢাকা রোটাং উপত্যকা। উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ে কুলু এবং লাহুল নামে দুটি জেলা আছে। রোটাং এই দুটি জেলার মধ্যে একমাত্র গিরিপথ। সারা অঞ্চলটাই অবশ্য হিমাচল প্রদেশের মধ্যে।

এই গিরিপথ খুব বিপজ্জনক। দু দিকে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের সারি। এক-একটা প্রায় কুড়ি হাজার ফিট উঁচু। খাড়া দেওয়াল বরফে ঢাকা। প্রকৃতি এখানে ডানপিটে ছেলের মত। কথাবার্তা নেই হঠাৎ শুরু হল তুষার-ঝড় আর হাড়-কাঁপানো হাওয়া। চলল দিনের পর দিন। মাঝে-মধ্যে বরফের ধস নামে পাহাড়ের গায়ে। তখন তোমার মনে হবে, পৃথিবীর ওপর এক সঙ্গে হাজারটা বাজ পড়ল।

বললে বিশ্বাস করবে না, ঠিক তোমাদের মত দুটি ছোট্ট ছেলেমেয়ে এই ভয়ংকর বিপদের মধ্যে অনায়াসে কুলু পাহাড় বেয়ে উঠে গিয়েছে সাড়ে চোদ্দ হাজার ফিট উঁচু চুড়োর ওপর। দুটো লাঠির ওপর পা রেখে বরফের ওপর পিছলে সোঁ সোঁ করে পার হয়ে গেছে বিপজ্জনক রোটাং গিরিপথ, আর পৌঁছে গেছে ৩০ কিলোমিটার দূরে লাহুল পর্বতমালার কোকসার পাহাড়ে। বানানো মনে হচ্ছে, তাই না ? ঘটনাটা কিন্তু সত্যি। এবার বলি শোন।

ভাইবোন দুজনেই সিমলার ছেলেমেয়ে বলে পাহাড়কে একদম ভয় পায় না। বারো বছরের ছেলে দীপক সেণ্ট এডোয়ার্ড স্কুলের ক্লাস সেভেনের ছাত্র। লেখাপড়ায় চমৎকার। ক্রিকেট, ঘোড়ায় চড়া আর নৌকো বাওয়াতেও ভীষণ ঝোঁক। ছোট বোন সঙ্গীতার বয়স মাত্র সাত হলে কী হবে, দাদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাহাড়ে চড়ে আর স্কি করে। সঙ্গীতা অক্‌ল্যাণ্ড হাউস স্কুলে ক্লাশ থ্রী-তে পড়ে, আর বাড়িতে শেখে ঘর-সাজানো, ছবি আঁকা আর গান। কাফ্‌রি-র 'হিমাচল প্রদেশ শীতকালীন ক্রীড়াসংঘের' সঙ্গে এরা দুজনেই যুক্ত।

ইউরোপের প্রায় সব দেশেই বরফের প্রান্তরের ওপর স্কি খেলার খুব চল আছে। পায়ের নীচে দুটো সরু কাঠের তক্তার মত থাকে, আর হাতে থাকে দুটো ছোট্ট লাঠি। লাঠিতে চাপ দিয়ে দিয়ে বরফের ওপর পিছলে এগিয়ে যেতে হয়। এ খেলা দেখতে মজার হলেও খুব বিপজ্জনক। টাল সামলাতে না পারলে পাহাড় থেকে কত নীচে যে ঠিকরে পড়বে তার ঠিক নেই।

এখন হল কী, ভারতীয় পর্বতারোহণ সংস্থা ১৯৭৫ সালের এপ্রিলে শিশুদের এক স্কি প্রতিযোগিতা করবেন বলে ঘোষণা করলেন।

ঠিক দিনে কর্মকর্তারা দলবল সমেত রাহ্‌লা পাহাড়ে পৌঁছুলেন। গাড়ি চলাচলের রাস্তা এই পর্যন্ত। এখান থেকে খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল সবাই, এমন কী শিশু প্রতিযোগীরাও। কয়েক ঘন্টা প্রচণ্ড কষ্ট করে পাঁচ কিলোমিটার দূরের মারহি-তে এসে যখন পৌঁছুল সবাই, তখন তুষার-ঝড় বইতে শুরু করেছে। ঝোড়ো আবহাওয়ার মধ্যে ওরা একটা হোটেলে রাতের মত আশ্রয় নিল সবাই। হোটেলটা একেবারে বরফে ঢেকে গিয়েছিল।

বাইরে প্রচণ্ড গর্জনে ছুটে চলেছে ঝড়। ঝুপ-ঝুপ করে বরফ পড়ছে সারা উপত্যকায়। ঠাণ্ডায় শরীর একেবারে জমে যাবার জোগাড়। যাই হোক, ১২ এপ্রিল সকাল আটটায় যাত্রা শুরু হল। হুক-লাগানো জুতো পায়ে বরফে ঢাকা পর্বতের গা বেয়ে শিশু-প্রতিযোগীদের সঙ্গে ওপরে উঠে গেল দীপক আর সঙ্গীতা। তখন চুড়োর ওপরে বিপাশা দেবীর মন্দিরও বরফের চাদরে মুড়ি দিয়েছে।

স্কি প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। ওদের মধ্যে দীপক আর সঙ্গীতা চমৎকারভাবে এগিয়ে চলল। থামল চোদ্দ কিলোমিটার দূরের কোকসারে এসে। ১৩ এপ্রিল আবার শুরু হলো স্কি দৌড়। সূর্য যখন ডিমের কুসুমের মত পাহাড়ের আড়ালে টুপ করে খসে পড়ছে, তখন ছোট্ট দুটি ভাইবোন সেই ভয়ংকর গিরিপথ পেরিয়ে লাহুল পর্বতের হরচানুল্লা পয়েন্টে পৌঁছে গেল।

পরদিন সকালেই গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে ওই ছেলে-মেয়ে দুটির নাম। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও ওদের আশীর্বাদ পাঠিয়ে বলেছেন, তোমাদের সাফল্যে আমি খুব খুশী হয়েছি। আশা করি ভবিষ্যতে তোমরা দেশের জন্যে সম্মান নিয়ে আসবে।

আরও খবর, সরকার থেকে ওদের জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। কম কথা তো নয় ! দীপক আর সঙ্গীতার আগে আর কোন ভারতীয় হিমালয়ের এত উঁচু চুড়োয় স্কি করতে সাহস করেনি। এবার তুমিই বল, ছোট্ট হলেও ওরা কি সত্যি-সত্যি বড় নয় ?

ছবি এঁকেছে অমিত চক্রবর্তী (বয়স ৭)

তোমাদের পাতা

আবোল-তাবোল

যাত্রা দেখতে যাত্রা করি,
হাটগেছিয়ার পানে,
মাঝপথেতে হাট বসেছে,
মাকড়ি কিনি কানে।
পানিহাটিতে পান কিনি ভাই,
চুন যে কাছে নাই।
চুনারেতে চুনের ঘাঁটি,
হাবুডুবু খাই॥
বাড়ি আমার কলকাতাতে,
আছে অনেক কল।
যতই টেপো মিস্ত্রী লাগাও
পড়বে নাকো জল॥

—ঈশিতা মিত্র (বয়স ১২)

তোমাদের চিঠি

… গ্রহণ করুন,
… ষষ্ঠ শ্রেণীতে
… একটা ছোট-
… করেছি। লাইব্রেরিতে প্রতি মাসে আনন্দমেলা রাখি তাতে ছোটদের অনেক লেখা ও আঁকা দেখতে পাই। খুব সুন্দর লাগে।

—চন্দন গুপ্ত (বয়স—৯)

আমি ও আমার ভাই আনন্দমেলার নিয়মিত পাঠক। আমার ভাই যখন তার বন্ধুদের কাছে কোনো গল্প বলতে যায় তখনই তার বন্ধুরা বলতে থাকে "জানি জানি, আনন্দমেলায় পড়েছি।" কী মুশকিল বলুন তো! আমরা কোথায় গল্প বলে বাহাদুরি নেব, তা না, বন্ধুরাই বাহাদুরি নেয়।

—সঞ্জয় মৈত্র

ইচ্ছে

আমার তো খুব ইচ্ছে ছিল মনে
শিকার করতে যাব আমি বনে।
যদি একবার দেখতাম রাজকন্যে
দূরে বিদেশে যেতাম তারি জন্যে।
তার বাড়ি হবে অচিনপুরের দেশে
পেঁছোবো সে অনেক দিনের শেষে।
তার বাবা হবেন প্রতাপশালী রাজা
শত্রু ধরে দেবেন কঠোর সাজা।
আঁধার কালো হবে যে তার চুল
খোঁপায় গুঁজে দেবে গোলাপ ফুল।
ফেনার মতো শুভ্র তাহার অঙ্গ
দেখে আমি যাব যে তার সঙ্গ।
সময় হলে তাদের বাড়ি যাবার
দেখে টেখে ফিরে আসব আবার।

সুমন্ত বসু
(বয়স ৮)

ছড়ার মিল

আনন্দ মেলা!
লেখা লেখা খেলা।
সোজা ব্যাঁকা
লাগে ছ্যাঁকা,
ন্যাকা খোকা,
ভারী বোকা।

আনন্দ মেলা!
লেখা লেখা খেলা—
মিল খুঁজে খুঁজে
কেটে গেল বেলা।

শতদীপা গুপ্ত (বয়স—৮)

ভুতো

দত্তবাবুর কোনো ছেলে বা মেয়ে ছিল না। কারও ছেলে বা মেয়ে না থাকলে দুঃখ থাকে, কিন্তু তাঁর কোনো দুঃখ ছিল না, কারণ তাঁর ছিল ভুতো নামে একটা বাঁদর। সে ছিল ঠিক তাঁর নিজের ছেলের মত। তাকে তিনি যা বলতেন সে তাই করত। দত্তবাবুর সিগারেট ভুতো দেশলাই জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিত। ভুতো যতই ভাল হোক না কেন সে তো বাঁদর, তাই রাত্তিরে একটা কদবেল গাছে উঠে ঘুমোত।

শুভাশিস আতর্থী
(বয়স ১০)

মামার বাড়ি

কিছুদিন আগে আমি মা ও বাবার সঙ্গে মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে স্কুলে গেলে আমার এক বন্ধু বলল, "কেমন লাগল মামার বাড়ি?" আমি বললাম, "খুব ভাল।" তখন ও আমাকে বলল, "তোর মামা ক'জন রে?" আমি বললাম, "আমার তো মামা নেই।" ও বলল, "তাহলে তুই মামার বাড়ি বলিস কেন?" স্কুল থেকে বাড়িতে এসে আমি মাকে বললাম, "মা, আমার তো মামা নেই, তাহলে তুমি মামার বাড়ি বল কেন?" তাই না শুনে মার চোখ একটু ছলছল করে উঠল। মা বললেন, "জানিস বাবু, আমার না অনেকদিন আগে একটা ভাই হয়েছিল, কিন্তু সে হাসপাতাল থেকে আর বাড়ি আসেনি।" এই কথা শোনার পরে আমি আর কোনোদিন মাকে এই নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

তপোজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
(বয়স ১০)

সুধীর কর্মকার
আলোকচিত্র নিখিল ভট্টাচার্য